কমা ও সেমিকোলন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



পি. কে. বসু য়্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—৩১

—আড়াই টাকা—

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফটো টাইপ স্টুডিও
টাইটেল পৃষ্ঠার ব্লক 'তরুণের স্বপ্নে'র সৌজন্যে

পি. কে. বসু য়্যাণ্ড কোং কলিকাতা—৩১ হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত
ও দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কলিকাতা—১১ হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

হাস্য ও করুণ রসের সব্যসাচী লেখক

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই লেখকের—

প্রিয়াশ্চরিত্রম্
প্রেরণা
সাবালক
মনে ছিল আশা
রাত্রির তপস্যা
দুর্ঘটনা
ভাড়াটে বাড়ী
বহুবিচিত্র
স্বর্ণমুকুর
রজনী-গন্ধা
পুরুষ ও রমণী
কোলাহল
নবযৌবন
স্মরণীয় দিন
চতুর্দ্দোলা
নববধূ
প্রভাত-সূর্য্য
মিলনান্ত
কাছে আছে যারা
সীমান্তরেখা
জ্যোতিষী
শ্রেষ্ঠ গল্প



গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কমা ও সেমিকোলন

উপমাটা দিয়েছিল ও খুব ছেলেবেলাতেই। তখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।

কথাটা হচ্ছিল ওরই নতুন একটা বদমাইসী নিয়ে। মাষ্টার মশাইদের বসবার চেয়ারের ওপর যে পাখা আছে, সেটা বন্ধ করে তার একটা ব্লেডের ওপর যদি একদোয়াত কালি রাখা যায় ত কেমন হয়? অর্থাৎ মাষ্টার মশাই এসে পাখাটা বন্ধ দেখে যখন খুলে দিতে বলবেন তখন গিয়ে শুধু ভালমানুষের মত পাখাটা খুলে দিয়ে এসে অপেক্ষা করা। তার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত অভাবনীয়ের অপেক্ষা আছে সেই উত্তেজনাই বিনয়কে অধীর করে তুলেছিল। সে খানিকটা বলেই বলে উঠল, 'উঃ কী মজাই হবে। ভাবতেই কেমন লাগছে!'

আমি বললাম, 'কিন্তু মাষ্টার মশাইয়ের গায়ে না পড়ে ছিটকে যদি আমাদের গায়ে এসে লাগে?'

'সে ত আরও মজা! ইস্—কথাটা এতদিন মাথায় যায়নি কেন!'

আমাদের অনেকেরই কিন্তু এতটা মজা ভাল লাগছিল না। আমি বললাম, 'দরকার নেই ভাই। যদি একটা কিছু হিতে বিপরীত হয়, যোগেনবাবু আবার রগচটা লোক। হেডমাষ্টার মশাইকে বলে দেবেন হয়ত—যদি ওঁর গায়ে লাগে ত কথাই নেই—সে বড় গোলমাল। কি করতে কি হবে, হয়ত বাবাদের ডেকে পাঠাবেন কি ফাইন করবেন—কিংবা রাষ্টিকেট, সে দরকার নেই।'

কমা ও সেমিকোলন

'তুই অত ভেবে তবে একটা মজা করবি? হরি হরি, তবেই হয়েছে।···অত ভাববার কি আছে? না হয় একটা গোলমাল হবে, না হয় বাড়ীতে বলে দেবে—মারই খাবো। না হয় রাষ্টিকেটই করলে। তাতেই বা ক্ষতি কি? একদিন কি দু'দিন—যত গোলমালই হোক তার বেশি ত নয়। সারা জীবনের তুলনায় কতটুকু বল্?'

তারপর একটু থেমে বেশ গম্ভীরভাবেই হাত পা নেড়ে বললে, 'ত্থাখ্ একটা কথা শুনে রাখ্। জীবনকে যদি একটা বাক্য ধরা যায় ত পূর্ণচ্ছেদ একবারই তাতে পড়ে, সবশেষে। মানে, মরব একবারই। সেই জানিস্ ত কী একটা কথা আছে শেক্স্পীয়ারের—কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইম্স্ বিফোর দেয়ার ডেথ্—নাকি ঐরকম গোছের।···সে যাই হোক—ঐ ফুলস্টপটা বাদ দিলে জীবনে যতই যা কিছু প্রচণ্ড একটা ঘটুক, জান্বি কমা কিংবা সেমিকোলন। মানে, ছোট আর মাঝারি। বড় রকমের কিছু নয়, অত ভাববারও কিছু নেই।'

কখন যে হেড-পণ্ডিত মশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। অকস্মাৎ দেখি আমাদের ঠেলে এগিয়ে এসে বিনয়ের মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'বড় দামী উপমা দিয়েছিস্ যে রে, তুই দেখছি ফিলজফার না হয়ে যাস্ না। বড় হয়ে এম-এতে ফিলজফি নিস্।··· হা-হা, বলে কি না কমা কিম্বা সেমিকোলন। বড় ভাল বলেছে ছোক্‌রা।'

তিনি আপন মনেই হাস্‌তে হাস্‌তে—যাকে বলে 'চাক্‌ল্' করতে করতে—চলে গেলেন।

সেই বিনয় ত!

কমা ও সেমিকোলন

সুতরাং জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী যে ওর এর চেয়ে বেশি-কিছু হবে তা আশা করাই অন্যায়।

ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে নিলে সায়ান্স—ওধারে আর একটা কলেজে সন্ধ্যাবেলায় কমার্স সেকশানে ভর্তি হয়ে বসে রইল।

প্রশ্ন করলুম, 'তার মানে?'

'দেখি না কোন্‌টা ভাল লাগে। যেটা সহজ মনে হয় সেইটে রাখব, বাকীটা ছেড়ে দেব।'

কথাটা অত সহজ বলে অবশ্য আমার মনে হ'ল না। প্রতিবাদ করে বললুম, 'কিন্তু সে রেজিষ্ট্রেশন নম্বরের হাঙ্গামা আছে, একই নামে দুটো নম্বর পড়বে। তাছাড়া দুটো পড়ার ষ্ট্রেন্ আছে ত—মাইনেও—'

'তোর স্বভাব আর বদলাল না দেখতে পাচ্ছি। অত ভবিষ্যৎ ভেবে সব কাজ করতে যাস্ কেন বল্ ত? লাইফ্ ইজ নট্ ওয়ার্থ হোয়াইল সো মাচ বদারেশন! আফ্‌টার অল, কমা কিংবা সেমিকোলন-এর চেয়ে বেশি কিছু আশঙ্কা ত নেই। সে শুধু জীবনে একবার—'

হাল ছেড়ে দিলুম। বিনয় কিন্তু সমানে দুটো ক্লাসই দু'বছর ধরে চালিয়ে কমার্সটা ছেড়ে দিলে, তাতেও স্কলারশিপ নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করলে। তারপর যখন বি-এস-সি পড়তে লাগল তখন সেন্ট-জেভিয়ার্স-এর ভ্যান্ নেষ্টি, ব্রিয়োঁ এবং নিয়োগী আড়ালে বলে বেড়াতে শুরু করলেন যে, 'য়্যানাদার রমন ইন্ দি মেকিং।' ফোর্থ ইয়ারে উঠে নিজের কাজ শেষ করে ল্যাবরেটারীতে যে সব রিসার্চ করছিল ও, এমন কি একটা পেপারও তৈরী করে ফেলেছিল, যে, অধ্যাপকদের এ আশা আমরা অনেকেই সমর্থন করছিলাম। কলেজের মুখ রাখবে ও—হয়ত কালে দেশেরও।

কমা ও সেমিকোলন

কিন্তু হঠাৎ পরীক্ষা দেবার আগে কলেজ ছেড়ে কোথায় চলে গেল বিনয়। আমরা স্তম্ভিত, বাপ মা ত অন্নজলই ছেড়ে দিলেন। অধ্যাপকদের পর্যন্ত দুঃখের সীমা রইল না। তাঁরা আলাদা পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে। তবু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বিনয় ফিরেও এল না কিংবা ওর কোন খবরও পাওয়া গেল না। পৃথিবীর ওপর থেকে যেন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এর প্রায় বছর ছয়েক পরে লক্ষ্ণৌ গিয়েছি কি একটা কাজে। আমিনাবাদের মোড়ে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা পিছন থেকে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসে কাঁধে হাত রাখলেন। চম্‌কে পিছন ফিরে চাইতেই সে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। তাতে আমি আরও অবাক হলুম। লোকটিকে ত আদৌ চিনি না—তবে এ লোকটা আমাকে দেখে হাসে কেন? অথচ পাগল গোছের লোকও ত নয়, বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। যোধপুরী চুড়িদার পাজামা, সেরওয়ানী, মাথায় দামী টুপি, হাতে ছড়ি। যেমন লক্ষ্ণৌর 'রইস' হয়। কে এ লোকটি?

কিন্তু মিনিটখানেক সে হাসিব দিকে চেয়ে থেকে মনে হ'ল এ হাসি আমার পরিচিত। তারপর ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কী রে অভি, চিন্‌তে পারলি না?'

আরে, বিনয় যে!

'কী ব্যাপার, এ কি কাণ্ড, এখানে কি করিস্?' এম্‌নি হাজার প্রশ্ন আমার কণ্ঠে ঠেলাঠেলি বাধিয়ে দিলে। ফলে প্রশ্ন করার একটা চেষ্টাই হ'ল, কোন প্রশ্নটাই ঠিক করা হ'ল না। সে একটু হেসে বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। চল্ আমার বাড়ী চল্। বলছি সব।'

কমা ও সেমিকোলন

এই বলে আমার একটা হাতের মধ্যে দিয়ে ওর হাতটা গলিয়ে টেনে নিয়ে গেল পার্কের ও কোণে যেখানে ওর টাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে। প্রাইভেট টাঙ্গা, বেশ দামী সাজ-পোশাক, চালকও খুব সম্ভ্রান্ত গোছের—বৃদ্ধ মুসলমান। টাঙ্গায় দুজনে পাশাপাশি উঠে বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সে একটু চুপ করে থেকে যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি বিয়ে করেছি যে। একটি ছেলেও হয়েছে।'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাঙালী ?'

'না। এই দেশী। আমিও ত আপাতত বাঙালী নই। আমি জোয়ালাপ্রসাদ।'

'তার মানে ?'

তার মানে যা ওর কাছ থেকে তখন কিছু এবং পরে বাকীটা সংগ্রহ করেছিলুম তা সংক্ষেপে এই : কলেজে পড়তে পড়তে বিনয়ের মনে হ'ল, এসবে লাভ কি ? জীবন ত ছোট, উপার্জনের সময়ও কম। গতানুগতিক ভাবে পড়ে ও পাস দিয়ে অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়ে কি হবে ? আর হয়ই যদি কিছু—তাতে দরকার কি ? আচম্কা একটা কিছু করা যাক না, অভাবনীয় কিছু !

'আফ্‌টার অল্, এত ভাববার কি আছে ? মরার বাড়া ত আর গাল নেই। জীবনে একবারই মরব। সে পূর্ণচ্ছেদের আগে সেণ্টেন্স্‌টাকে যতটা পারি মধুর ক'রে তোলা যাক্ না, শুধু লম্বা ক'রে বাড়িয়ে লাভ কি ? জীবনকে বিচিত্র ও অভিনব করে তোল্‌বার মত উত্তেজনা আর কি আছে ?'

যেদিন কথাটা মনে হয় সেইদিনই কলেজে না গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে বিনা টিকিটে একটা গাড়ীতে চড়ে বসে। সেটা পাঞ্জাব এক্স্‌প্রেস।

কমা ও সেমিকোলন

লক্ষ্ণৌ অবধি নির্বিবাদে আসার পর একজন চেকার ধরে ওকে এবং সঙ্গে ভাড়া দেবার মত কিছু নেই দেখে ওকে নামিয়ে দেয়। সেই জন্যই বিশেষ করে লক্ষ্ণৌতে আসা। নইলে তেমন কিছু ঠিক ছিল না।

অবশ্য কিছু ছিল ওর পকেটে। তিনটাকা ন' আনা। আর ছিল হাত-ঘড়িটা। সেটা বেচে আট টাকা পাওয়া গেল। চোরাই সন্দেহ করে তার চেয়ে বেশি আর কেউ দিলে না। এই বারো টাকা মূলধনে কি করবে ও? একটা দিন ধর্মশালাতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে। পরের দিন উঠে বস্তিতে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে, তারপর তারে বাঁধা একটা তোলা উনুন, একটা কড়া, কিছু তেল ও গামলা নিয়ে বসে গেল পকৌড়ী ভাজতে পানদরিবার মোড়ে।

প্রথম প্রথম ওর অসুবিধা হ'ত—জিনিসটা ভাল তৈরী করতে পারত না বলে। ক্রমশঃ শিখে নিলে, মাথাও খাটালে কিছু কিছু। ফলে বেশ বিক্রী হ'তে লাগল। খাওয়া পরা এমন কি সিনেমা দেখা সিদ্ধি খাওয়ার পরও হাতে কিছু জমতে লাগল।

মোড়েই বসত সবজিওলা সরযূপ্রসাদ। ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপটা ঘনিষ্ঠ হ'তে জানতে পারলে যে সরযূপ্রসাদ বেশ বড় বংশের ছেলে। একটা বিপুল মোকদ্দমার পাকে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এই ব্যবসা ধরেছে। অথচ ওরই সে মোকদ্দমায় জেতবার কথা।

মোকদ্দমার বিবরণ শুনে বিনয়েরও তাই মনে হ'ল। আইন জানে না বটে কিন্তু স্রেফ কমন্ সেন্সেই এটা বোঝা যায়।

দিনকতক পকৌড়ী ভাজা ছেড়ে দিলে সে। ভাল ধোপদস্ত কাপড়-জামা পরে লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে ঘুরতে লাগল। সুকৌশলে এক উকীলের সঙ্গেও ভাব করে নিল। তার ঘরে বসে আইনের বই পড়ে

পড়ে মোটামুটি সরযূপ্রসাদের কেসটা বুঝতে পারলে। তারপর করলে এক অসমসাহসিক কাজ। কলকাতার উকীল বলে নিজের পরিচয় দিয়ে এখানকার এক ছোকরা উকীল'ক দিয়ে নতুন ক'রে মোকদ্দমা শুরু করলে। সে ছোক্‌রা শুধু কলের পুতুলের মত ওর কথা শুনে যায়। সে কিছু বোঝেও না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। মোকদ্দমাটা চালায় বিনয়ই।

কিন্তু একটু একটু করে মোকদ্দমাটা জেতে সে। মুন্সেফকোর্ট থেকে জজকোর্ট, সেখান থেকে হাইকোর্ট। ওরই তদ্বির এবং চেষ্টায় মোকদ্দমার ফলাফল দ্রুত বেরিয়ে গেল। সরযূপ্রসাদই জিতল। অবশ্য ইতিমধ্যে ওর এবং সরযূপ্রসাদের যা কিছু সঞ্চিত টাকা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দুটো কোর্টে জেতবার পর হাইকোর্টের সময় আর টাকার অভাব হ'ল না। বিস্তর মহাজন পাওয়া গেল।······

লা টুস রোডের ওপর অপেক্ষাকৃত নতুন একটা বাড়ীতে এসে গাড়ী থামল। বিনয় নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসালে। নিজেও একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আফ্‌টার অল, জীবনটা একটা য়্যাডভেঞ্চার, একটা নিরবচ্ছিন্ন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট, তাই নয় কি? টাকা পাবার পর বুড়ো সরযূপ্রসাদ বেশি দিন বাঁচেনি। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা সৎকাজ করে গিয়েছিল—জমিদারী বেচে টাকাটা নগদ করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এবং শেয়ারে গচ্ছিত করে দিয়ে গেছে মেয়ের নামে।···ওর কী যে আমাকে ভাল লেগেছিল জানি না, একরকম জোর করেই আমার সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেল। সরযূপ্রসাদ জানত আমি বাঙালী কিন্তু তাতে তার আটকাল না, শুধু পরিচয়টা গোপন রেখে গেল সে নিজেই। জোয়ালাপ্রসাদ তারই দেওয়া নাম। আমি এখন ভূমিহার ব্রাহ্মণ!'

'এরা বুঝতে পারে না?'

'পাগল ! আমি পারফেক্ট হিন্দুস্তানী এখন।'

বিনয় ভেতর থেকে ওর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। কুড়ি একুশ বছরের একহারা গড়নের মেয়ে, উত্তর প্রদেশের মেয়েরা যেমন সুশ্রী হয় তেমনই —উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ একটা শান্ত শ্রী আছে মেয়েটির মুখে চোখে।

পরিচয় করিয়ে দিলে, বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানীতে, 'ইনি আমার বন্ধু অভিজিৎ সেন আর ইনি আমার স্ত্রী গৌরী দেবী।'

গৌরী মিষ্টি হেসে নমস্কার করলে হাত তুলে। ছেলেমেয়েদেরও দেখলাম। ফুটফুটে দেবশিশুর মত।

বললাম, 'তা, বাড়ীতে খবর দিস্ নি কেন ?'

'কী দরকার ? এই নিয়ে আবার একটা হাঙ্গামা, অশান্তি। শোকটা ত তারা একরকম ভুলেই গেছে এতদিনে, আমাকে বাদ দিয়ে বেশ চলেও যাচ্ছে, তবে আর মিছিমিছি হাঙ্গামা করা কেন ? লাইফে অত বদারেশনের সময় কোথা ?'

'তা বটে। তবুও—'

'থাক্‌গে। আর তবুতে কাজ নেই।'

আহারাদি ও আপ্যায়নের মধ্যে দিনটা বেশ কাটল। আরও দুদিন রইলাম ওর অতিথি হয়ে। শুধু বিদায়ের সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে বাড়ীতে গিয়ে না বলি কিছু।

চলে আসবার সময় ঈর্ষাতে আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল শুধু। বরাত বটে ছোকরার। বেশ আছে। এ'কেই বলে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা। একেবারে যাকে বলে ছাপ্পড় ফুঁড়ে পাওয়া !

এরও বছর পাঁচ-ছয় পরে কি একটা ছুটিতে তারকের বাড়ী যাচ্ছিলুম।

কমা ও সেমিকোলন

কাটোয়া লাইনের সালার ষ্টেশনে নেমে মাইল সাতেক গো-গাড়ী করে যেতে হয়। তারকই তাদের মোষের গাড়ী পাঠিয়েছিল। বেশ চওড়া প্রশস্ত গাড়ী, পুরু করে খড় বিছানো। তার ওপর শতরঞ্জি ও চাদর পাতা। উঠেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। যার নাম ত চার ঘণ্টার পথ—বেশ একটা টানা ঘুম দেওয়া যাবে 'খন্।

কতটা গেছি জানি না, অকস্মাৎ একটা প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। কোনমতে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুমের ঘোরটা ভাল করে ছাড়ল, দেখি গাড়ী এমন কাত হয়ে পড়েছে যে উঠে বসার উপায় নেই—আসলে আমি তখন ছইয়ের ওপরই পড়ে আছি, বিছানা খড় আমার পিঠে, বাক্সটা আর বালিশটা কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে তা জানি না।

হৈ হৈ পড়ে গেছে কিন্তু বাইরে ইতিমধ্যেই! কারা যেন সব আলো নিয়ে ছুটে আসছে। দু'চারজন গাড়ীটাকে সোজা করার চেষ্টা করলে, পারলে না। তখন কোনমতে আমাকেই টেনে বার করলে গাড়ী থেকে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, শ্রীমান্ চালকও বসে বসে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তাটা এক জায়গায় বিষম ভাঙা, তাতে কদিন আগে বৃষ্টির ফলে খানিকটা জল জমে আছে। মহিষের স্বাভাবিক জলপ্রীতির ফলে সে সেই জলের দিকে বেঁকে গেছে—বারণ করার লোক ছিল না—তাইতেই গাড়ী পাশের নালায় পড়েছে কাত হয়ে।

আমাকে উদ্ধার করার পর পাঁচ সাত জন মিলে মোষটাকে তোলবার চেষ্টা করলে কিন্তু দেখা গেল যে মহিষাসুর অত সহজে উঠবেন না। হয়ত বা পা-ই ভেঙে গেছে। তখন দু'একজন ছুটল বাঁশ আনতে দুটো, মজবুত দেখে। এই ফাঁকে আমি চারিদিকে তাকালাম। একটা গ্রামের মধ্যেই বলতে গেলে গাড়ীটা পড়েছে। মুসলমানের গ্রাম, চারিদিকেই

কমা ও সেমিকোলন

লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা চাষী মুসলমান। এদেশে চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই কে সম্পন্ন আর কে গরীব। তবু অবস্থা ভাল বলেই বোধ হয়। গোটা দুই প্রায় নতুন হ্যারিকেন লণ্ঠন এসে গেছে ইতিমধ্যেই। ডিবেও বেরিয়েছে চার পাঁচটা।

ওরই মধ্যে কে একজন প্রস্তাব করলে, 'বাবু চলুন, আমাদের কারও ঘরে বসবেন। যদি আপিত্য না থাকে ত একটু মিষ্টি দুধও খান গরীবেব ঘরে। তারপর আপনার মোষ উঠলে যদি পারে ত যাবে, নইলে গো-গাড়ী একখানা বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। তার জন্য চিন্তা করবেন না।'

প্রস্তাবটা মন্দ লাগছিল না। খিদেও পেয়েছে বেশ। কাটোয়াতে সামান্য একটু কি জলখাবার খেয়েছিলাম, সে কখন হজম হয়ে গেছে।

তবু একটু ভদ্রতা করে 'আবার কেন কষ্ট দেওয়া' বা ঐ ধরণের কিছু একটা বল্‌তে যাব এমন সময় ওরই মধ্যে কে একজন এগিয়ে এসে বললে, 'বাবুকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি চলো—একজন কেউ রসগোল্লা পাওয়া যায় কিনা দেখগে মানেক মেঞার ওখানে—'

'কেন, তোমার ওখানে কেন? ও ভাই নবাবজান—বড় মেঞাব ওখানে বসালে হ'ত না।'

'না না—বোঝ না। বাবু আমার অনেক দিনের দোস্ত্। এখনও চেনতে পারেনি।'

সে আবার কি কথা? নবাবজান আমার দোস্ত। এখানে?

ভাল ক'রে তাকালাম! সেই ময়লা লুঙ্গি ও আধময়লা গেঞ্জি। ঘন কালো চাপদাড়ি। সামনের গোঁফ সেমিটিক ধরণে ছাঁটা, মাথায় যথোচিত ময়লা তেল-চিটচিটে একটা কাপড়ের টুপি।

'কি অভিজিৎ বাবু, চিন্‌তে পারলেন না?'

কমা ও সেমিকোলন

কণ্ঠস্বরটা যেন নিতান্ত অপরিচিত নয়, এখন মনে হ'ল। যেন কোন্ সুদূর বিস্মৃতির দেশ থেকে, যেন কবেকার কোন্ এক প্রীতির স্পর্শ বহন করে আনছে এ গলার স্বর। ধরতে পারছি না ঠিক্, তবে আবছা একটা পরিচয়কে অস্বীকারও করতে পারছি না, আমার তখন এই অবস্থা।

কী সর্বনাশ! অকস্মাৎ ধ্বক্ করে কথাটা মনে পড়ে গেল। কী একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে স্মৃতির দুয়ার খুলে গেল। কিন্তু যে দম্‌কা হাওয়া ঢুকল অন্তরের সেই মণিকোঠায় তাতে সেখানকার অনেক কিছু উড়িয়ে গুলিয়ে তাল পাকিয়ে দিল। বিহ্বল অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলাম।

বিনয়!

এবার সে হাসল। যেটুকু সন্দেহ ছিল, ঐ হাসিতে সব ধুয়ে মুছে গেল।

'বিনয় তুই, এখানে, এ'বেশে?'

'আজ্ঞা নবাবজান। আপনার বান্দা।'

সে এগিয়ে এসে নিঃসন্দেহে আমার হাতটা ধরলে। সাধারণ কৃষি-জীবীর মতই রুক্ষ, কর্কশ, বলিষ্ঠ হয়ে গেছে ওর হাত। অথচ এককালে খুবই কোমল ছিল তা জানি। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে কতকটা মন্ত্রাবিষ্টের মতই চললাম।

একটা ঝক্‌ঝকে নিকানো মাটির দোতালা ঘর, যেমন রাঢ় দেশে হয়। তারই দাওয়ায় একটা চৌকী পাতা, চৌকীর ওপর মাদুর বিছানো। সেইখানেই আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

'তুই ত তামাক খাস্ না। খেলেও এ দা-কাটা তামাক তোর চলবে না। আমিই একটু খাই। তুই সিগারেট ধরা। চা চলবে নাকি, চা? চাও আছে।'

'তা ত আছে, কিন্তু এ কী—'

কমা ও সেমিকোলন

'হচ্ছে হচ্ছে।—আমিনা, ও আমিনা! বেগম সাহেবা, শুনবে নাকি একবার?' মুসলমান ধরণে কাপড় পরা, এদেশেরই মাটির মেয়ে একটি বেরিয়ে এল, মাথায় ঘোমটা। নবাবজান বললে, 'অত আর ঘোম্‌টা দিতে হবে না। ও আমার ছেলেবেলার দোস্ত। খুব খানদানী লোক— হঠাৎ খোদার দোয়ায় যোগাযোগ হয়ে গেল।...একটু চা করো দিকি— মানেক মেয়ার ওখানে পাঠিয়েছি জব্বরকে রসগোল্লার জন্যে।'

মেয়েটি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল। তেম্‌নি নিঃশব্দেই চলে গেল। নবাব নিজের খেলো হুঁকোটা তুলে নিয়ে একটা টান্ দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বললে, 'নাঃ, নিভে গিয়েছে। সিগারেট দে।' মিনিট-খানেক দুজনেই চুপচাপ। তারপর সে-ই হেসে বললে, 'তোর ত পেট ফুল্‌ছে। তবে শোন্। কিন্তু কীই বা শুনবি—' একটু অন্যমনস্ক ভাবেই থেমে যায় সে। 'কিছু না, বুঝলি'—বিনয়ই শুরু করলে আবার, 'কী যে হ'ল হঠাৎ, এই আমিনার বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজমীরে গিয়েছিল তীর্থ করতে, সেখান থেকে দিল্লী আগ্রা হয়ে লক্ষ্ণৌ এসেছে। নেমেছিল এক কোন্ মোল্লার বাড়ী, সেখান থেকে যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। বাদশাবাগের দিকে যাচ্ছিলুম বেড়াতে, দেখি রাস্তায় বসে বুড়ো কাঁদছে। একটি বর্ণও হিন্দি উর্দু জানে না, ও তার শোকের কারণ বলে যাচ্ছে বাংলাতে, আর এরা অনবরত প্রশ্ন করছে উর্দুতে। বাংলা কথা, বিশেষত মেঠো কথা কতকাল শুনিনি। কি যে মনটার মধ্যে করে উঠল কি বলব তোকে। ভীড় ঠেলে কাছে গেলুম। দু-একটা প্রশ্ন করে সব জানলুম। তারপর গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে এলুম। খাইয়ে দাইয়ে গাড়ীভাড়া দিয়ে পরের দিনই দেশে পাঠিয়ে দিলুম।'

আবারও মিনিট খানেক নিঃশব্দে সিগারেট টেনে বললে, 'বুড়ো ত

চলে এল। কিন্তু সেইথেকে বাংলাদেশ যে কী এক অদৃশ্য টানে অহরহ টান্‌তে লাগল কি বলব। বিশেষত এই বুড়োর সঙ্গে কথা কয়ে এই সরল-জীবন চাষীদের সুখদুঃখের নান. কথা শুনে কেবলই মনে হ'তে লাগল, জীবনটা এখনও ঢের দেখতে বাকী। দিনকতক ধরেই ভাবতে লাগলুম। ব্যস্‌, তারপরই একদিন দুত্তোর বলে ট্রেনে চেপে একেবারে এখানে। বুড়ো ঠিকানা দিয়েই এসেছিল—অনেক ক'রে বলে এসেছিল একবার ওর বাড়ীতে আসতে। ও ত আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে। বুড়োর বুড়ী তখনও বেঁচে ছিল, দুজনে কী যত্ন আমাকে। একেবারে ছেলের মত। মেয়েটাও বড় বাধ্য—বুঝলি, সাতচড়ে রা নেই, কোন অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে জানে না।·· তারপর? তারপর আর কি—বুড়ো পেড়াপীড়ি শুরু করলে আমিনাকে বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে। বুড়োই এই ঘর তুলে দিলে—গোরু বাছুর, চাষের জমিজমা দিয়ে দিলে,—আমি এখন রীতিমত সম্পন্ন গৃহস্থ। বুড়ো বেঁচে আছে—ঐ ওপাশে ওদের আসল ভিটে। নিজের বাড়ীতেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজী হইনি।'

বিনয় বেশ সহজে কথাগুলো বলে গেল। কিন্তু আমি শিউরে উঠলুম।

'গৌরীদেবী? তার কি হল?'

'সে আছে। বেশ ভালই আছে বোধ হয়। টাকাকড়ি ত সবই আমাদের দুজনের নামে ছিল। যে কোন নামেই তোলা যাবে এমন বন্দোবস্ত করে রেখেছিলুম। তার কোন অসুবিধা হবে না। সে টাকা আমি একপয়সাও ছুঁইনি এখানে এসে।'

'স্কাউন্‌ড্রেল!' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'টাকাটাই কি সব?

কমা ও সেমিকোলন

অমন একটা মেয়ে, ইনোসেণ্ট, লাভিং মেয়ে—তার জীবনটা নিয়ে ছেলেখেলা করবার কী অধিকার আছে তোমার? এ একটা কত বড় ক্যাটাস্ট্রফি তার জীবনে, তা তুই কি করে বুঝবি, অমানুষ বর্বর!'

'তুই উত্তেজিত হোসনি খামকা। চুপ কর্। ক্যাটাস্ট্রফি কি আবার? জীবনে ঝড়-ঝাপ্টা আসে। কোথাও কমা পড়ে, কোথাও সেমিকোলন। পূর্ণচ্ছেদ পড়ল ত শেষই হয়ে গেল। ভেবে দেখ্ আমি ত মরতেও পারতুম। কত লোক ত অল্প বয়সে মরে, তাদের বিধবারা কি করে! ধরে নে আমি মরেই গেছি। অন্তত তার জীবনে তাই ত বটে।'

'তোর ছেলেমেয়ে, তাদের কথাও একটু ভাবলি না?'

'ভাববার কি আছে। আমি মরে গেলে তারা যেমন ভাবে মানুষ হ'ত এখনও তেমনি ভাবেই মানুষ হবে। তা ছাড়া, গৌরী খুব এফিসিয়েণ্ট মেয়ে—ছেলেমেয়ে ভালই মানুষ করবে। তাকে কেউ ঠকিয়ে টাকাকড়ি নেবে, সে চিন্তাও নেই। না, সে ভালই আছে—মাঝখান থেকে তার ভাবনা ভেবে আমার লাইফ্টা মাটি করব কেন? ভেবে দেখ্ একটাই ত মোট জীবন, কতটুকু তার সময়। অথচ জীবনে কত দেখবার, কত রকম ভাবে জীবনটাকে ভোগ করবার রয়েছে বল্ দেখি! আমি মরে যেতে পারতুম, পাগল হয়ে যেতে পারতুম। তাতে ত কেউ আমায় স্কাউন্ড্রেল বলত না—অথচ গৌরীর কষ্ট তাতে কিছু কমত কি তখন?'

ইতিমধ্যে কে একটি লোক একটা বাটি করে রসগোল্লা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে আমিনা একটা রেকাবীতে আটটা রসগোল্লা ও এক কাপ চা এনে চৌকীতে রেখে নিঃশব্দে আমাকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলো, তারও মুখ অনেকখানিই ঘোমটায় ঢাকা, তবু যতটা মনে হ'ল বেশ সুশ্রী মুখখানি! ভারি মিষ্টি আর ঠাণ্ডা।

কিন্তু আমার মনে তখন অসহ একটা ক্রোধ গুম্‌রে বেড়াচ্ছে। তার সব আঘাতটাই গিয়ে প'ড়ল এই নিরীহ সরল মেয়েটির ওপর।

হঠাৎ বেশ রুক্ষকণ্ঠেই বলে উঠলুম, 'তোমরা জানতে যে এই লোকটার আর একটা স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব ছিল। তবু ওকে এই ভাবে ভুলিয়ে এখানে রেখে এ ভাবে বেঁধে ফেলা কি ঠিক হয়েছে? তোমাদের সমাজে এর অন্য প্রতিকার আছে। স্বামী বর্তমানে তাকে তালাক দিয়ে অপরকে বিয়ে করার কোন বাধা নেই। এসব ক্ষেত্রে তোমাদের ঘরে দুঃখ দূর করার উপায় আছে। কিন্তু সে মেয়েটির যে ও-সব কোনদিকই খোলা নেই—এটা তোমাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল না? তার কী কষ্টে দিন কাটছে বল দেখি—!'

আমিনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একরকমের ফুল আছে যা সামান্য উষ্ণ বাতাসেই আউতে পড়ে—আমিনা যেন সেই ধরণেরই ফুলের মত নরম। ওর ঠোঁট কিছুক্ষণ ধরে থর-থর করে কাঁপবার পর স্বর বেরোল—'তিনি যদি এখানে আসেন ত আমি মাথায় করে রাখব। আমি তাঁর বাঁদী হয়ে থাকব—'

আমার মনে হ'ল এটা অসহ্য ন্যাকামি। আরও রূঢ় কণ্ঠে বললাম, 'তুমি বেশ জান যে সেটা সম্ভব নয়, মিছামিছি ন্যাকামি করে লাভ কি। তার ধর্ম, তার সমাজ, সংস্কার—সব আলাদা, সে কখনও এখানে এই আবহাওয়ায় সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে পারে না।'

এবার ওর দুই কপোল বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। সে কেমন একটা অসহায় আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি আমাকে জুতো মারুন। আমাদের খারাবি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ওনাকে আমি ছাড়তে

পারব না। আমারে বলবেন না এমন কথা।' সে আর দাঁড়াল না। দ্রুত ঘরের মধ্যে চলে গেল। বেশ বুঝলুম কাঁদতেই গেল।

বিনয় এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। বরং কেমন একটা প্রফুল্ল স্মিত-মুখে বসে ছিল। হয়ত বা মুচ্‌কে হাসছিল। এইবার সে মুখ খুললে, 'লাভ হ'ল কিছু? মিছিমিছি ওকে আঘাত দেবার চেষ্টা করে তুই-ই আঘাত পেলি। উঁ-হু, যতই অস্বীকার করতে চেষ্টা করিস, তোর একটা কষ্ট হবেই।...আমি জানি ওকে আঘাত করা যায় না।'

আমি কিন্তু গুম্ হয়ে বসে রইলাম। বিনয়ের কথাই ঠিক, ফুলের মত নরম মেয়েটাকে তিরস্কার ক'রে আমারই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তাতে যেন আরও রাগ বেড়ে গেল। চাও খেলাম না। বিনয় পীড়াপীড়ি করল অনেক, রাতটা থাকবার জন্য, কিছুতেই রাজি হলাম না। স্পষ্টই বললাম, 'আমার এখানে এক মুহূর্তও থাকতে ঘৃণা বোধ হয়।'

গাড়ীর বন্দোবস্ত হওয়া মাত্র রওনা হয়ে পড়লাম। কিন্তু বিনয় যে তাতে দুঃখিত বা অনুতপ্ত হ'ল তা মনে হয় না।

এরপর আর তার কোন খবর পাইনি। নিইনিও। ইতিমধ্যে বার-দুই লক্ষ্ণৌতেও গিয়েছি কিন্তু ইচ্ছে করেই গৌরীর সঙ্গে দেখা করিনি। কী হবে দেখা ক'রে—ও মর্মান্তিক সংবাদ দেওয়ার চেয়ে এতদিন সে যা বিশ্বাস করেছে সেই বিশ্বাস নিয়ে থাকাই ভাল। যা হোক একটা প্রলেপ পড়েছে নিশ্চয়ই। মিছিমিছি খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি?

তাছাড়া, আমার কী পরিচয়? সেই পাষণ্ডের বন্ধু, এই ত! সেই পরিচয় নিয়ে না যাওয়াই ভাল।

হঠাৎ, একেবারে বলতে গেলে এই সেদিন, দেখা হয়ে গেল বিনয়ের

সঙ্গে। গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছি বসে, দেখি এক দীর্ঘাকৃতি দেশী সাহেব আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সহসা ফিরে দাঁড়িয়ে কাছে এল। টুপিটা খুলতেই চিনতে পারলুম। দামী পোশাক। মুখে চুরুট। মানিয়েছেও বেশ, খাঁটি সাহেবের মতই দেখাচ্ছে।

'হ্যাল্লো! অভি যে! কথা কইবি, না রাগ আছে?'

সত্যি বলতে কি, এতদিনে রাগ বিশেষ ছিল না। ববং কৌতূহল প্রবল। হেসে বললাম, 'বোস বোস। আর ন্যাকামো করতে হবে না।···তারপর প্রভুর আবার এ কি নব কলেবর! এবারে কী অবতার মূর্তি ধারণ করেছেন ভগবান্?'

বিনয় হেসে বললে, 'গ্রীয়ারসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, চৌরঙ্গীতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি। পাক্কা সাহেব। খানসামা আরদালি প্রভৃতি নিয়ে ঘর-কন্না। এবারে আর সেই অর্দ্ধেক রাজত্বও নেই, রাজপুত্রীও নেই। তোর ঈর্ষার কারণ নেই।'

'আমিনা?'

'বেশ আছে। তারও ছেলে হয়েছে একটা। মানুষ করুক। সে আর একটা বিয়ে করলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু তা সে করবে না। সে যাই হোক্—কী আর করা যাবে! কতকাল আর ঐ কুয়োয় থাকা যায় বল্। একটা মেয়ের ভালবাসা এমন কিছু নয় যাতে জীবনের সব কিছু সরিয়ে রাখা যায় মন থেকে।'

'তুই এমন নিরেট পাষণ্ড যে এসব আলোচনাও করব না—এমন কি তিরস্কারও করব না। কারণ, জানি তা বৃথা। সে কথা থাক্, এখন বিনা টীকায় ঘটনাটা বলে যা।'

'ঘটনা এমন কিছুই নয়। হঠাৎ একদিন অসহ্য মনে হ'ল। মনে হ'ল

আমি যেন মরে গেছি। পৃথিবীতে কত কি ঘট্‌ছে আমাকে বাদ দিয়েই—আমি তার কোন খবরই রাখছি না। একবস্ত্রে চলে এলাম। আমিনাকে একরকম বলেই এসেছি। মেয়েটা কান্নাকাটি করলে। তাকে কথা দিয়ে আসতে হয়েছে, সে বা আমি মরবার আগে আর একবার যাবো তার কাছে নিশ্চয়ই।'

'ও কথা থাক্। তারপর গ্রীয়ারসন কোম্পানী?'

'বলছি। কলকাতায় এসে শুনলুম বাবা মারা গেছেন, মাও তাই। কিন্তু আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে যান নি। আইনত আমি অনেক টাকার মালিক। ভাইটা খুব ওড়াচ্ছে। সবটা রেস্ খেলে উড়িয়ে দেবে হয়ত, লাভ কি? আমি বিষয়ের দখল নিলাম। তারপর একদিন ঘটনাচক্রে এই কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে আলাপ। যুদ্ধে গিয়েছিল, এসে দেখছে যে কর্মচারীরা সব চুরি করে মেরে দিয়েছে, ব্যবসার অবস্থা খারাপ। সে সব বেচে দিয়ে দেশে চলে যাবে। আমার কি-একটা ঝোঁক চাপল। আমি তাকে বেচতে দিলাম না। টাকা কিছু য়্যাডভান্স করলাম। তাতে তার একটু বিশ্বাস হ'ল আমার ওপর। তারপর খেটে-খুটে জিনিসটাকে আবার দাঁড় করিয়েছি। সাহেব খুশী হয়ে আমাকে তার পার্টনার আর ম্যানেজার করে দিয়ে বিলেত চলে গেছে।'

'বেশ ত। কিন্তু ততঃ কিম্। এই কি তোমার জীবন দেখা? জীবনের বিভিন্ন স্বাদ নেওয়া? এ ত গৌরীকে নিয়েই করতে পারতে।'

'তা বটে। গৌরীর সঙ্গে এর মধ্যে দেখা ক'রে এসেছি যে!'

'আরে! সে কি? বলিস নি ত!'

'হ্যাঁ। হঠাৎ মনে হ'ল চলে গেলাম। দেখে সে খুশীই হ'ল তিরস্কার করেনি বিশেষ। বললে, জানতুম যে তোমাকে বাঁধা যাবে না।

বেশ ভালই মানুষ করছে দেখলুম ছেলেমেয়েদুটোকে। তবে সে-ই আমাকে বিদায় দিলে, বললে, যদি মনে করো যে চিরকাল থাকতে পারবে ত থাকো, নইলে চলে যাও। না হলে ছেলেমেয়েগুলোর ওপর অবিচার করা হবে।···আমি চলেই এলাম। তবে এখন বেশ গুড্ টার্ম্‌স্। প্রায়ই চিঠি লেখে আমাকে।'

'অদ্ভুত চীজ তুমি বাবা। নমস্কার।' হাত তুলে সত্যই নমস্কার করলাম।

'তা নয় রে। জীবন সম্বন্ধে কিন্তু এইবার আমার ধারণা বদলাচ্ছে। সত্যিই মনে হচ্ছে যে, যেটাকে এতদিন জীবনের সার্থকতা ভেবে এসেছি সেটা কিছু নয়। এ'কে ঠিক জীবন উপভোগও বলে না।···কী করলাম! জীবনটা কত কাজে লাগানো যেত, জীবনের মূল্য কত বেশি আদায় হ'তে পারত!···নাঃ, বুড়োটা আমার মাথা খারাপ করে দিলে। সমস্ত সেন্‌স্ অফ ভ্যালুজ্ যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, 'কে বুড়ো?'

'গান্ধিজী।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে সে যেন অস্থির হয়ে উঠে বেঞ্চিটার সামনে খানিকটা পায়চারি করলে। তারপরেই অকস্মাৎ বললে, 'তবে আসি। যাস্ একদিন।'

যেতে যেতেই ঠিকানাটা বললে চেঁচিয়ে। আর আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে দেখতে দেখতে বহুদূর চলে গেল।

গান্ধিজী তখন নোয়াখালীতে। অমৃতের ভাণ্ড ও পরম আশ্বাস নিয়ে নগ্নপদে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছেন।

তাহ'লে বিনয়ের মাথাতেও তিনি ঢুকতে পেরেছেন! ধন্য গান্ধিজী!

কমা ও সেমিকোলন

তারপর আবার খবর পেলাম এই মাত্র কয়েকদিন আগে।

ওর অফিসেরই একটি ছোকরা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে খবর দিল, সাহেব হাসপাতালে, বাঁচবার আর বিশেষ আশা নেই—আমাকে নাকি একবার দেখতে চান।

'সে কি! কি হয়েছে?' হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করি।

তাতে সে যা বললে তার সারাংশ এই: এবার গোলমাল বাধতেই সাহেবের কি হ'ল তিনি অফিসের কাজ সব সেরে ফেলে মোটামুটি এমন একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন যাতে তিনি কিছুদিন না থাকলেও কোন অসুবিধা না হয়। তারপর নিজে একবস্ত্রে চলে গেলেন মাণিকতলার দিকে একটা বস্তিতে। সেখানেই কদিন ছিলেন, বস্তিরই লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ওদেরই একটা ঘরে থাকতেন। সারা রাত জেগে পাহারা দিতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও-বস্তিতে কোন গোলযোগ হয় নি। ছেলেরা অনিষ্ট করতে এসেও ফিরে গেছে। কিছুক্ষণ ওঁর কথা শুনে সকলেই বুঝেছে যে এ পথে সমস্যার কোন মীমাংসা হতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ কাল একটি ছেলে হাতবোমা ছুঁড়ে মারে। সেটার অনেকখানি আগুন ওঁকে সইতে হয়েছে। অবস্থা খারাপ, বাঁচবার বিশেষ আশা নেই।

তখনই হাসপাতালে গেলাম। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুধু মুখটাই খোলা। ইসারায় আরও কাছে যেতে বলে, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বললে, 'চললুম অভি। কিন্তু একটা কাজ বাকী আছে। আমিনারা কী অবস্থায় আছে জানি না। সবাই হয়ত তাকে ফেলেই পালিয়েছে। সকলে যদি যায়ও, সে যাবে না আমি জানি। আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তাকে কথা দেওয়া ছিল মরবার আগে দেখা করব। লক্ষ্মী ভাইটি, তুই একবার

যা। তোকেই শুধু চেনে সে, আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। আর কারুর সঙ্গে আসবেও না।···তাকে কোনমতে উদ্ধার করে নিয়ে এসে গৌরীর কাছে পৌঁছে দিস্। গৌরী সব জানে, সে আমিনার সব ভার নেবে, তার ছেলেরও।···ব্যস্, শুধু তার কাছে পৌঁছে দিয়েই তোর সব দায়িত্ব শেষ।'

'কিন্তু তোর কাছে আনব না? দেখা করবি না?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করি।

'আর সে সময় কোথা? আমার শেষ হয়ে আসছে বুঝছিস্ না?'

তারপর একটু হেসে বললে, 'আফ্‌টার অল, ফুলস্টপ ত পড়তেই হ'ত কোথাও না কোথাও। মিছিমিছি সেন্‌টেন্‌স্ টেনে বাড়িয়ে লাভ নেই।···এইবার কমা সেমিকোলনের পালা শেষ হ'ল আর কি!'

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বিনয় মারা গেল।

আদিম

তিনটি ছেলেই মারা গেছে, বড় নাতি কজনও নেই—ছিল শুধু শিব-রাত্রির সল্‌তে, পৌত্র বলতে এই অম্বরনাথ। চৌদ্দদিন টাইফয়েডে ভুগে সে-ও গেল।

রূপে গুণে—নাতির মত নাতি। এই অম্বরনাথ যখন প্রথম হয় রমাসুন্দরী এক দণ্ডও বুক থেকে নামাতেন না। ছেলেবেলা থেকে বরাবর সব পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আইন পাস করে আইনের কলেজের প্রোফেসর হয়েছিলেন—ওকালতিতেও যথেষ্ট নাম। এ-হেন অম্বরনাথ মাত্র আট-চল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন!

কিন্তু আশ্চর্য এই, রমাসুন্দরী তা বুঝতেও পারলেন না। কান্নার শব্দ যখন প্রবল হয়ে উঠল—বাড়ী থেকে বার করার সময়—বুড়ীর একবার চেতনা এসেছিল, 'হ্যাঁরে—ওরে কে আছিস্ রে ছেলেমেয়েরা, যেন কান্নার শব্দ পাচ্ছি না? কী হয়েছে রে, কাদের বাড়ীতে কাঁদছে?'

বুড়ীর চোখ এবং কান দুই-ই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

ঝি-চাকররা সুদ্ধ কেঁদে আকুল, উত্তর দেবে কে?

কে যেন একটি পাড়ার ছেলে কানের কাছে হেঁকে বললে, 'ও কত্তামা, অম্বরবাবু মারা গেলেন যে, আপনার অম্বরনাথ! বুঝতে পারছেন না?'

বুড়ী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শূন্য পানে, তারপর বললে, 'ও, তা হবে।'

অপেক্ষাকৃত নতুন ঝি মঙ্গলা চোখ মুছে বললে আপন মনেই, 'মুগে

আগুন! একটার পর একটাকে খাচ্ছেন আর নিজে বসে আছেন অখণ্ড পেরমাই নিয়ে, আকন্দর ডাল মুড়ী দিয়ে! যমেরও অরুচি গা!'

রমাসুন্দরীর যে কত বয়স হয়েছে তা কেউ জানে না। এক শ কিংবা তার বেশি। অন্তত খুব কম নয়। তিন ছেলেই পরিণত বয়সে মারা গেছেন। নাতিরাও খুব অল্পবয়সে কেউ যায়নি। বিধবা হয়েছেন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। ভাল ক'রে চলতে পারেন না, ঝুঁকে-পড়ে ভুঁয়ে-মুয়ে হয়ে চলেন মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়ে। চোখে খুব পুরু লেন্সের চশমা দিয়েও দেখতে পান না ভাল, কানে কম শোনেন। স্মৃতি-শক্তি কবেই চলে গেছে—ধারণা বোধশক্তিও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু মৃত্যু নেই—বেঁচে আছেন ঠিক, বছরের পর বছর।

তিন ছেলে, সাত পৌত্র, চব্বিশটি প্রপৌত্র—জাজ্বল্যমান সংসার; বিরাট বাড়ী—ঝি-চাকবে আত্মীয়-স্বজনে গম্ গম্ করছে। রমাসুন্দরী তাদের সবাইকে চেনেনও না—চিনতে চেষ্টাও করেন না। দোতালায় সিঁড়ির পাশেব ঘরটি আগলে, পুরানো আমলের একটা লোহার সিন্দুকে ঠেস দিয়ে বসে বসে দন্তহীন মাড়ি দুটো পাকলান আপন মনেই। কারুর পায়ের শব্দ পেলে শুধু মুখ তুলে দৃষ্টিহীন চোখ দুটো যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে বলেন, 'হ্যাঁরে—এই, কে যাচ্ছিস রে? ছোট বৌ?' (একুশ বছর আগে সে মারা গেছে)…'হ্যাঁরে আজ ভাত দিলিনি আমাকে? খেতে দিবি কখন লো?…কেউ আমাকে খেতে দেয় না! আমার কথা কারুর খেয়ালই থাকে না!'

খাওয়ার পরমুহূর্তেই ভুলে যান—এবং অনুযোগ করেন যে কেউ খেতে দিচ্ছে না। তবে অনুযোগটা খুব প্রবল হয় না। সত্যি সত্যিই কোন

দিন ভাত দিতে দেরি হ'লে গুণ গুণ ক'রে কাঁদেন আপন মনে, 'ওগো তুমি কোথায় গেলে গো, তোমার ছেলেদের হাতে পড়ে আমার কী হাল হচ্ছে গো! একটিবার দেখে যাও গো! আমাকে এরা দু পায়ে থ্যাত্‌লাচ্ছে—' ইত্যাদি।

কেউ হয়ত ঘরে ঢুক্‌ল—দম্‌কা হাওয়ার মত, কোন ছেলেমেয়ে। বিশেষ ক'রে বিজয়ার দিন সবাই একবার ক'রে আসে মাথা ঠুক্‌তে। পায়ে হাত দিলেই তিনি খপ্‌ ক'রে তার হাতটা ধরে ফেলে প্রশ্ন করেন, 'ওরে এই, তুই কে রে? কার ছেলে রে?'

'ও কর্ত্তা-মা—আমি, আমি তোমার হীরুর ছেলে!'

'হীরু? কে হীরু রে? কাদের হীরু?'

"এই মরেছে! হীরু, হীরু—তোমার নাতি হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

'ও, হীরু। হীরু আমার নাতি, না? তুই তার ছেলে? বেশ বেশ। ওরে, তুই কে রে?'

'আমি দীপু, তোমার বেবির মেয়ে। তোমার নাৎনী নলিনীর মেয়ে বেবি।'

'ও, তা হবে। অত মনে থাকে না। তোর মা বেঁচে আছে?'

'ওমা; সে কি অলুক্ষুণে কথা। বেঁচে থাকবে না কেন?'

'তা কৈ, সে এল না?'

'এই ত এসেছিল—এইমাত্র।'

কে জানে বাপু, মনে থাকে না।'

বুড়ী আবার বসে বসে মাড়ি পাকলায় আর ঝিমোয়।

এই ভাবেই দিনরাত্রি কাটে বুড়ীর—সব দিনই সমান ওর কাছে।

অম্বরনাথের মৃত্যুসংবাদটা ঠিক বুঝতে না পারলেও রমাসুন্দরী

তাঁর শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন ভিয়ান বসতেই তিনি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ রে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে কাদের বাড়ী থেকে না? হ্যাঁ বে অ ছোটবৌ…এই ছেলেমেয়েরা?'

কেউ সাড়া দেয় না। বুড়ীর ঘরে সাধারণত কেউ ঢোকেও না—কথার উত্তরও দেয় না।

রমাসুন্দরী উঠে দোর গোড়ায় আসেন, হেঁট হয়ে লাঠি ধরে ধরে, 'ওরে অ খুকী, কে যাচ্ছিস্ রে—'

'কেন কত্তা-মা?' বছর-দশেক বয়সের একটি ফুট্‌ফুটে খুকী এসে কাছে দাঁড়ায়।

'পান্তুয়া ভাজা হচ্ছে কাদের বাড়ী না?'

'আমাদের বাড়ী—আবার কাদের বাড়ী।'

'আমাদের বাড়ী? কেন রে?'

'লোকজন খাবে।'

'অ—তা আমাকে দিলি না তোরা?'

'দাঁড়াও—সবে ত তৈরী হচ্ছে! লোকজন কাল খাবে।'

মঙ্গলা নিচে থেকেই শুনতে পেয়ে যেন দাঁত কিড়মিড় করে।

'হ্যাঁ, তা খাবে না! মুখে আগুন তোমার। নাতির ছেরাদ্দের মিষ্টি খাবার জন্যে নোলা সক্‌সক্ করছে একেবারে!'

রমাসুন্দরী আপনমনেই বিড় বিড় ক'রে কি বকেন

আরও খানিকটা পরে আবার ডাকেন, 'ক্ষুদী অ ক্ষুদী—ক্ষুদী কোথা গেলি রে?'

'ঐ নাও!' পুরানো চাকর রঘু বলে ওঠে, 'হাসব কি কাঁদব, ভেবে

পাই না। এখানে ওর ক্ষুদী কোথায় বলো ত, সে শ্বশুরবাড়ী বসে বিষম খাবে।'

ক্ষুদী হ'ল আসলে অম্বরনাথেরই বোন। পাতিয়ালায় থাকে সে। তার আসা সম্ভব হয়নি। এসেছে তার বড় ছেলে রাঘব।

'ও রাঘব, যাও না বুড়ীর কাছে—তোমার মাকেই ডাকছে।'

কুড়ি একুশ বছরের পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছেলে রাঘব সিঁড়ি বেয়ে তর তর ক'রে ওপরে উঠে আসে, 'কী হয়েছে, ও বুড়ী ?'

'তুই কে রে ? কার ছেলে ?'

'আমি ক্ষুদীর ছেলে।'

'আ মরণ ! ক্ষুদীর আবার ছেলে হ'ল কবে ?'

বুড়ী আবারও বিড় বিড় করে, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা ! চালাকি !'

বিরক্ত হয়ে রাঘব চলে যায়। বুড়ী কাঁদে গুণ গুণ ক'রে।

অনেক রাত্রে কার বুঝি দয়া হয়। বলে, 'আহা দাও, দাও, দিয়ে এস। ওরই ত সব—ছেলেপুলে নাতিনাতনী, ওরই ত সংসার। দিয়ে এসো দুটো মিষ্টি—'

পূর্ণিমা—অম্বরনাথেরই ভাইঝি, একটা পাতায় ক'রে দুটো পান্তুয়া, দুটো দরবেশ আর একটা সন্দেশ এনে সামনে দিয়ে বসে, 'এই নাও বুড়ী, আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে হবে না। খাও।'

বুড়ী হাৎড়ে হাৎড়ে মিষ্টিগুলো অনুভব করে, 'হ্যাঁ রে, এত মিষ্টি কোথা থেকে এল রে ?···'

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে সব ব্যাপারটা।

'অত খোঁজে দরকার কি। পেয়েছ, গেলো।···আবার হিসেবটুকু চাই ষোল আনা।'

কমা ও সেমিকোলন

অনেক রাত অবধি বুড়ী মিষ্টিগুলো খায় পাক্‌লে পাক্‌লে।

পরের দিন আবার সচেতন হ'য়ে ওঠে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। হালুইকরদের রান্নার গন্ধে একটা বিশেষত্ব আছে—সে স্মৃতি বুড়ীর মাথা থেকে মুছে যায়নি একেবারে। বাতাস শোঁকে আর বলে—'হ্যাঁ রে কিসের যজ্ঞি রে তোদের বাড়ী? অ মেজ বৌ, কার বিয়ে? হ্যাঁরে অ ছেলেমেয়েরা, শোন্‌না এদিকে—'

ওদিকে শ্রাদ্ধ শুরু হয়েছে, কোন্ বিখ্যাত কীর্তনিয়ার দল এসেছে গাইতে। এদিকে রান্না চলছে দ্রুত, দুপুর থেকেই কিছু কিছু লোক খাবে। সবাই ব্যস্ত। বুড়ীর সঙ্গে বকবে কে?

কেউই যখন উত্তর দিলে না তখন বুড়ী নিজেই হাৎড়ে হাৎড়ে সিঁড়ির কাছে এল, পা দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির ধাপ অনুভব ক'রে বসে বসে নামতে লাগল, এক ধাপ এক ধাপ ক'রে—

প্রায় যখন মাঝামাঝি এসে পৌচেছে তখন কে যেন দেখতে পেল, 'এই ত্থাখো, মরেছে! বুড়ী কোথা চলল। হাঁ-হাঁ, করো কি, অ কত্তা-মা। কোথা যাচ্ছ?'

'কিসের যজ্ঞি হচ্ছে তাই দেখতে যাচ্ছি। আমাকে কেউ কিছু বলে না, জানায় না।...আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই? আমাকে এত অপছেদ্দা কেন?'

বুড়ী রাগে পরিশ্রমে কাঁপে থর থর ক'রে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমাকে দেবে খেতে, খাবার তৈরি হ'লেই। তুমি চলো এখন ওপরে। পড়ে মরবে যে! বুড়ো বয়সে হাত পা ভাঙলে কে তোমাকে দেখবে।'

'কিসের যজ্ঞি আগে বল্।'

'শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ!...হ'লো?'

'কার শ্রাদ্ধ?'

'তোমার নাতি অমু বাবুর।'

'আমার নাতি? আমার নাতিরা সব মরে গেছে।' সহজকণ্ঠেই বলে বুড়ী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাইত। মরে গেছে বলেই ত শ্রাদ্ধ। তুমি এখন ওপরে চলো।'

কোনমতে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে আসে—একরকম জোর করেই।

বুড়ীর পাশের ঘরটাই অপেক্ষাকৃত খালি ছিল, সেই ঘরে মিষ্টির ভাঁড়ার করা হয়েছিল। সন্দেশ দরবেশ পান্তুয়া ছানার জিলিপী আর খাস্তার কচুরী ভাজিয়ে এইখানে রাখা হয়েছিল। তরকারী লুচি সব নিচে সুতরাং এ ঘরে লোকজনের আনাগোনা কম।

বুড়ী হাৎড়ে হাৎড়ে দোরের কাছে এসে ডাকে, 'ওখানে বসে কে রে?

'তার বেলা ত চোখ খুব সাফ!' এবাড়ীর এক নাত্‌জামাই দেবেশ-বাবুকে দেওয়া হয়েছিল এ ঘরের ভাঁড়ার আগ্‌লাবার ভার, তিনি গল্প করার লোকাভাবে একটা হাল্‌কা চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে বসে সিগারেট টানছিলেন, এখন তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে কাছে এলেন, 'অ কত্তা-মা, কী বলছিলেন?'

'কে রে তুই?'

'আমি দেবেশ। নলিনীর বর।'

দেবেশের আবছা সাদা মূর্তিটার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে খানিকট চেয়ে থেকে বুড়ী বললে, 'অ। তা এখানে কি?'

কমা ও সেমিকোলন

'এই যে ভাঁড়ার আগ্‌লাচ্ছি।'

'কিসের ভাঁড়ার ?'

'মিষ্টির ভাঁড়ার। পান্তুয়া সন্দেশ খাস্তার কচুরী সব আছে এখানে। খাবেন দু'টো ?'

দৃষ্টিহীন চক্ষুই যেন জ্বলে ওঠে লুব্ধ আগ্রহে, 'দে না দুটো রে। খাস্তার কচুরী দু-খানা দে।'

দেবেশবাবুর করুণা হয়। খান-দুই কচুরী এনে দেন হাতে।

'আর দুখানা দে বাবা। দে দে, তোর ভাল হবে।'

'কত খাবে বুড়ী ? মরবে যে!' তবু আর দুখানা দেন তিনি।

আঁচলে ক'রে কচুরীগুলো নিয়ে গিয়ে বুড়ী কোথায় রেখে আসে।

'হ্যাঁ গো অ ছেলে, আছ ওখানে ?' দেবেশবাবুর সাদা ঝাপসা মূর্তিটা আর দেখা যায় না। দেবেশবাবু তখন পান খাবার অছিলায় নিচে নেমে গেছেন। ভবানীপুর থেকে সম্পর্কে তাঁর মাস্‌তুতো শালীর দল এসেছে—রূপসী ও বিদুষী, তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে করতে খেয়ালই ছিল না তাঁর ভাঁড়ারের কথা। অনেকক্ষণ পরে কে একজন এসে মনে করিয়ে দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ওপরে এসে দেখেন বুড়ী বারান্দায় বসে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে—

'কী হ'ল, কী হ'ল—অ কত্তা-মা ?'

অপরাধী কাছেই ছিল, ততক্ষণে আরও জন-কতক এসে জড়ো হয়েছে। ছেলেরা পরিবেশন করার জন্য ওপর নিচে করছে দ্রুত, সেই সময়ে বুঝি বুড়ী সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, একটি ছেলে নেমে আসতে গিয়ে হঠাৎ সামনে পড়ায় নিজেকে সামলাতে পারেনি, ধাক্কা লেগে বুড়ী ছিটকে পড়ে গেছে।

কমা ও সেমিকোলন

'কোথাও লেগেছে নাকি?' দেবেশবাবু প্রশ্ন করেন চেঁচিয়ে।

'লেগেছে না ছাই! ওর রাগটাই বেশি।' একটি ছোক্‌রা বলে উঠল।

'আঁমাকেঁ খুঁন্‌ ক'রে ফেঁলেছে এঁকেবারে!' বুড়ী নাকে কাঁদতে কাঁদতে বলে।

'আচ্ছা, আচ্ছা আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি, আপনি এখন ঘরে চলুন।'

দেবেশবাবু একরকম পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ঘরে দিয়ে আসেন বুড়ীকে।

হয়ত সত্যিই কোথাও লেগেছিল। কারণ বুড়ী সারারাত গোঁঙালে। কিন্তু সেদিন আর তার দিকে মন দেবে কে? পরের দিন কে একজন দেখে বললে, 'কর্তা-মার জ্বর হয়েছে যে।'

'মরুকগে! বুড়ীদের জ্বর হয়ই।'

দুপুরবেলা ঠাকুর খাবার দিতে এসে দেখলে জ্বরে অচৈতন্য। তখন কর্তাদের কানে গেল। বিকেল নাগাদ ডাক্তারও এল। ডাক্তার বললেন, 'হাড়টাড় ভেঙেছে বলে ত বুঝতে পারছি না—তেমন ত কোথাও ফুলে নেই। এক্স-রে করলে—তাই বা কোথায় করব?'

এমনি সাধারণ ওষুধ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পরের দিন থেকে পেট ছাড়ল। অর্থাৎ বোঝা গেল যে এইবার সময় আসন্ন। তারও পরের দিন শ্বাস ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর জ্ঞান ফিরে এল, ঘোলা চোখ মেলে যেন কাকে খুজে অতিকষ্টে বললে, 'অমু, অম্বরনাথ!'

কমা ও সেমিকোলন

'কাকে ডাকছ কত্তা-মা ?' একটি বধূ মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করলে।

'আমার নাতি অমু, সে কোথা গেল ?'

'তিনি যে মারা গেছেন কত্তা-মা, তাঁরই শ্রাদ্ধ হয়ে গেল যে !'

'মারা গেছে ? তোরা ত আমাকে বলিস্ নি। আহা !'

একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুড়ী ক্লান্তিতে চোখ বুজল আবার।

'কত্তা-মা, অ কত্তা-মা !'

সবাই ডাকাডাকি করতে লাগল। রমাসুন্দরী কিন্তু আর চোখ খুললেন না। শুধু দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ঠোঁট দুটো নড়তে সবাই কান পেতে শুনলে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন তিনি, 'কচুরী।'

'কিসের কচুরী কত্তা-মা ? কচুরী খাবেন ?'

আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। একটু পরে শেষ একবার ঠোঁট নড়ল, 'নাম শোনা।'

গঙ্গাজলও কে একজন দিলে। কানের কাছে জোরে জোরে নাম শোনাতে লাগল। তারই মধ্যে একসময়ে মুখটা ফাঁক হয়ে গেল, গলার কাছে শ্বাসটা ধুক্ ধুক্ করছিল, সেটা গেল বন্ধ হয়ে।

এতদিনে ছুটি হ'ল বুড়ীর।

বুড়ী মরবার পর রঘু ঘর ধুতে এসে আবিষ্কার করলে সিন্দুকের নিচে, ঠাকুরের ছবি-রাখা চৌকীর তলায় একরাশ খাস্তার কচুরী। দু খানা নয়, চার খানা নয়,—অন্তত ত্রিশ বত্রিশ খানা। অর্থাৎ দেবেশবাবু যখন নিচে ছিলেন তখন বুড়ী চুরি ক'রে ক'রে এনে রেখেছে। সেই সময়েই, বোধহয়

কমা ও সেমিকোলন

কেউ এসে পড়বে কিনা তারই খোঁজ করতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে ছেলেটির সঙ্গে।

'মরণ! বুড়ো বয়স অব্দি নোলা ছ্যাখো দিকি!'

'বলিস্‌নি রঘু। বুড়ো হ'লে বোধ হয় তোরও অমনি হবে।' কে একজন ধমক দিয়ে উঠল।

চাল, ডাল ও তেল

প্রভাত পাত্র হিসেবে সেদিন সত্যিই লোভনীয় ছিল—মানে পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে। এম-এ পাস, সরকারী অফিসে চাকরী করে, মাইনে ইত্যাদি মিলিয়ে মাস গেলে সওয়া দুশ'র কাছাকাছি পায়, বয়স ত্রিশের মধ্যে, দেখতেও খুব খারাপ নয়, মাথা গোঁজবার মত নিজস্ব একটা বাড়ীও আছে বালিগঞ্জে—আর কি চায় লোকে? আপনার মেয়ে থাকলে আপনিও এর চেয়ে বেশি কামনা করতেন না নিশ্চয়ই!

সুতরাং পাত্রীর পিতা-মামা-ভ্রাতাদের দিনকতক হাঁটা-হাঁটির অন্ত ছিল না। বেশ লাগ্‌ত প্রভাতের। আত্মপ্রসাদের অনির্বচনীয় একটা মাদকতা অনুভব করত সে—অন্তরে অন্তরে। এতগুলি লোক তাকে মেয়ে দেবার জন্য উন্মুখ, এতগুলি কিশোরী তাকে পেলে তাদের তপস্যার সাক্ষাৎ ফল বলে মনে করবে, জীবন সার্থক মান্‌বে। বাজারে তার এত মূল্য! এতগুলি লোকের উদ্বেগ, ঔৎসুক্য এবং আগ্রহের লক্ষ্য সে—একমাত্র সে-ই। জীবনের একটা মধুময় নাটকের সে নায়ক।

তারা ধাওয়া করত বৈকি! চারিদিকেই! বিরক্ত হ'ত প্রভাত, বিরক্তি প্রকাশ করত। তারা অফিসে যেত, 'একবার শুনুন' বলে যখন বাইরে ডাকত তখন মুখে রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠত। ওর ঘরে ঢুকে ফিস্ ফিস্ করে অন্য লোকের কাছে ওর পাত্রা জিজ্ঞাসা করত যখন তারা—বাতাসে টের পেত প্রভাত। মুখে গাম্ভীর্য এবং কাজের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ ফুটিয়ে তুল্‌ত।

কমা ও সেমিকোলন

কোন কোন প্রস্তাব আসত অফিসের বাবুদের ধরে। কারুর ভাগ্নী, কারুর শালীর মেয়ে—কারুর বা সাক্ষাৎ শালী। স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেকে কথা পাড়েন, কোন্ এক বন্ধুর মেয়ে আছে তাঁর।

বাড়ীতে আসে ঘটকের দল। আর আসে মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণীরা—অফিসের ফেরৎ বা রবিবার সকালে। প্রভাত অপূর্ব একটা তৃপ্তি অনুভব করে, এই সময়কার প্রতিটি মুহূর্ত যেন উপভোগ ক'রে ক'রে যায় সে। মুখে প্রকাশ করে অসীম উপেক্ষা ও বিরক্তি, 'পাগল ক'রে তুল্লে! আমাকে দেখছি কোথাও তিষ্ঠুতে দেবে না একদণ্ড! এ জ্বালা মিটলে বাঁচি যে! শুধু এই বিরক্তির হাত থেকে বাঁচতেই দেখছি আমাকে একটা বিয়ে করতে হবে যেখানে হোক্'—ইত্যাদি।

মেয়ে দেখা চলে নিয়মিত। রবিবারে দুটো এবং শনিবারে একটা ক'রে।

প্রভাত কিন্তু মেয়ে দেখবার আগেই সতর্ক করে দেয় উমেদারদের, 'বাবা বেঁচে থাক্‌লে এসব কথা আমাকে বল্‌তে হ'ত না। মাথার ওপর যখন কেউ নেই তখন আমাকেই কথাটা পাড়তে হবে—দুটো বোনের বিয়ে দিয়েছি, এখনও একটা বোনের বিয়ে দিতে হবে। দুটো ভাই পড়ছে—তাদের খরচও কম নয়। ···টাকা চাই আমার কিছু!'

'কত তবু?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রার্থীর দল।

'তিনটি হাজার টাকা নগদ চাই আমার। তারপর মেয়েকে আর কিছু দিন্ বা না দিন্—আমার কিছু এসে-যায় না। বরাভরণ—দানসামগ্রী, কোনটাতেই আমার কোন লোভ নেই।'

'তি-ন হা-জা-র!' অক্ষরগুলোর ওপর অনর্থক একটু জোর দিয়ে, একটু টেনে টেনে কেউ হয়ত বিবর্ণ মুখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

কমা ও সেমিকোলন

'হ্যাঁ। কি করব। অনেক ভেবে দেখেছি—এর কমে হবে না। হাজার-বারোশ' টাকা যাবে ত বিয়েরই খরচা। ওপরে একটা ঘর তুলতেই হবে। তুলে নিচেটা ভাড়া দেব। আয় বাড়াবার একটা উপায় না ক'রে ত আর রিস্‌ক নিতে পারি না।'

কেউ কেউ তখনই পিছিয়ে যায়। কেউ কেউ তবুও জোর ক'রে মেয়ে দেখায়—এই ভরসায় যে, মেয়ে একবার চোখে লেগে গেলে দর আরও কমবে। হাজার হোক—ছোক্‌রা, ডাগর মেয়ে চোখে ধরলে টাকার জন্য কি আর আট্‌কাবে? পাত্রদের মেয়ে দেখানো ঢের ভাল।

কিন্তু প্রভাতকে তাঁরা চেনেন নি।

মেয়ে সম্বন্ধেও একটা কথা ওর ছিল—মেয়ে ফরসা হওয়া চাই। তবু তেমন মেয়েও মিল্‌ল বৈকি, কোন কোন খানে। কিন্তু তারপর যখন মেয়ের বাবা হাজার-বারশ' টাকা থেকে দর শুরু করলেন তখনই প্রভাত রূঢ়ভাবে সে ধারণা তাঁদের ভেঙে দিলে, 'মাফ করবেন—এত দরদস্তুর করতে আমি আসিনি। আগেই আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, মিছিমিছি কেন সময় নষ্ট করলেন?'

তবু বিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সেই বন্ধু-কন্যাই। মেয়ে দেখতে ভাল। মেয়ের বাবা-মা আছেন, বাবা ভাল সরকারী চাকরী করেন। মেয়ের গায়ের রং খুব ফরসা না হ'লেও মাজা মাজা—উজ্জ্বল শ্যাম যাকে বলে। মুখশ্রী ভাল। ঠিক হ'ল—তিন নয়, আড়াই হাজার টাকা দেবেন তাঁরা নগদ। আর দেবেন বারো ভরি সোনা, ঘড়ি, আংটি, (ঘড়িটাই পড়বে শুধু তিনশ' টাকা—বড়বাবু শুনিয়ে দিলেন) খাট বিছানা আলমারি—সব, কমপ্লিট্।

বড়বাবু নিজে প্রভাতকে ডেকে অনুরোধ করলেন, 'এইতেই হ্যাঁ

ওদের ঘর-খরচা সুদ্ধ সাত হাজার টাকা পড়ে যাবে। সত্যিই ত কিছু আর তোমাকে একগাদা টাকা দিয়ে মেয়েকে ন্যাড়াবুঁচো ক'রে পাঠাতে পারে না। ওদেরও ত একটা নিজেদের তৃপ্তি আছে। অতগুলো টাকা শুধু তোমাকেই দেবে আর মেয়ে থাকবে শুধু-হাতে—এ কখনও হয়? এইতেই তুমি রাজী হয়ে যাও। আর এ জিনিসগুলোও ত দরকার, ঘর করতে গেলে কোন্‌টার দরকার হয় না বলো।...বরং তুমি এধারে একটু হাতটা টিপে খরচা ক'রো—যাতে হাজারের মধ্যে সারতে পারো, তাই দেখো।'

প্রভাতকে রাজী হ'তে হ'লো।

কিন্তু যেটা হ'লো না সেটা হচ্ছে হাতটা টিপে খরচা করা! মা, কাকীমা এবং পাড়ার আধুনিক-প্রবীণা গিন্নীরা মিলিয়ে যে ফর্দ করলেন গায়ে হলুদের, তা দেখে প্রভাতের চক্ষুস্থির। তার অনেক বাদ দিলেও অনেকটাই কিন্তু বাদ দেওয়া গেল না। কারণ পদে পদে বাধা আসে চারিদিক থেকে। মা বলেন, 'আহা, অতবড় ঘরের একটা মেয়ে আনছিস—এটুকু না করলে ভাল দেখাবে কেন? তাছাড়া, ওরা অত দিচ্ছে—তার বদলে এখান থেকে চুপি বিদেয়ের মত সামান্য তত্ত্ব গেলে ওরা বল্‌বে কি? প্রথম চোটেই কুটুম খিঁচ্‌ড়ে যাবে যে!'

প্রভাত বলে, 'এ ত ভাল জ্বালা হ'ল দেখছি। বড় ঘরে বিয়ে করার কী দরকার ছিল আমার তা হ'লে?'

কুট্‌ ক'রে ছোট বোন্‌ পুনি উত্তর দেয়, 'নইলে অতগুলো টাকা দিত কে দাদা?'

তা বটে।

কমা ও সেমিকোলন

ফর্দ্দের দফায় কাটবার চেষ্টা করে প্রভাত, কিন্তু সেখানেও সুবিধা হয় না। পাড়ার নবীনা গিন্নীরা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেন, 'ওমা, তিনটে সায়ার কম দিলে লোকে ছি ছি ক রবে যে! তাও ত রেশমী সায়া ধরিনি—' প্রবীণারা বলেন, 'ঠিক নিয়ম মত ধরতে গেলে একটা গয়না দেওয়াও উচিত। তবে সে তোমাদের ক্ষ্যামতা নেই তাই—'

জামা অসংখ্য। রেশমের, অর্গ্যাণ্ডির, ভয়েলের, জর্জেটের, সাটিনের, আরও কত কি। কোনটায় লেস্ বুনে দিতে হবে, কোনটায় বা ছুঁচের কাজ হবে। বিবাহিতা বোনেরা তবু দয়া ক'রে ঘরেই ক'রে দিতে রাজী হয়েছেন। খালি বেনারসী আর গরদটা বাইরে দিতে হবে—জর্জেটটাও দিলে ভাল হয়। তিন-ছয় আঠারো টাকা চলে গেল শুধু মজুরী।

এমনি ক'রে চল্‌তে চল্‌তে যখন চারথালা মিষ্টি এবং ক্ষীর দই মাছে এসে পৌঁচেছে তখন পাকা দেখার দিন যে হাজার টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়েছিল সে টাকা উবে গিয়ে বাজারে তিনশ' টাকা ধার হয়ে গেছে! তবু পাকা-দেখাতে যে দেড়শ' টাকা (কানের গয়নাটা নিয়ে) ধার হয়েছিল সেটা ধরাই হয়নি! মার গায়ের যা সোনা ছিল তা দুটি বোনের বিয়েতে নিঃশেষ হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে গেছে বাবার লাইফ্ ইন্সিওরের সামান্য যে কটা টাকা ছিল—সব। এই বাড়ীটা তিনি মরবার ঠিক আগেই করেছিলেন—শেষ করতে পারেননি। তাঁর সারা জীবনের (সরকারী কেরাণী জীবন—পেন্সন নেওয়ার আগেই গেছেন—পেন্সন বিক্রী করতে পারেননি। প্রভিডেন্ট ফণ্ডও নেই) সঞ্চয় সব চলে গেছে ঐতেই; বরং কিছু খুচরো ঋণ ছিল, তা শোধ করতে হয়েছে ঐ লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকা থেকেই—

কমা ও সেমিকোলন

তত্ত্ব ছাড়াও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদে অভ্যাগত মহিলাদের আহার, এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে আগত কুটুম্বদের সেবায় আরও বেশ-কিছু থোক্ বেরিয়ে গেল। ফলে প্রভাত যখন বিবাহে যাত্রা করলে তখনই কেমন যেন মনের জোর ফুরিয়ে গেছে—উদ্যাগপর্বের সে গর্ব, সে আত্মতৃপ্তির কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুকের মধ্যেটা যেন দমে যাচ্ছে—নানা রকমের আশঙ্কা উঁকি ঝুঁকি মারছে। আনন্দ আগ্রহ এবই ভেতর যেন চলে গেছে বহুদূরে—

গাড়ী চলছে (ফুল দিয়ে সাজাবার ইচ্ছা ছিল বোনদের—এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছে প্রভাত)—আর প্রভাত ভাবছে, কাল সকালের বকমাবী খরচ, বৌভাত—

তবু আসরে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে প্রভাত। হাঁা, খুশী হবার কথা বটে। কলকাতার ভাড়াটে বাড়ীর সংকীর্ণ ও স্যাঁৎসেতে উঠান যেন অর্থের যাদুস্পর্শে ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠেছে। খুব উঁচুতে ছাদসুদ্ধ ঘিবে পাল টাঙানো হয়েছে, তাব নিচে মূল্যবান সামিয়ানা। আবার তার থে,ানের ওপরে ভেলভেটের চন্দ্রাতপ। সে চন্দ্রাতপ খাটানো হয়েছে যে চাবটি খুঁটির ওপর তাতে ফুল জড়ানো—গে,ানটা ফুলে ঢাকা। চারিদিকের লোনাধরা ভাঙা পাঁচিল ঢেকে সাদা চাদর টাঙানো, তাতে বড় বড় ফুলেব চাকা ঝুলছে।

প্রভাতের মনের ভার যেন নেমে যায় কোন্ মন্ত্রবলে। ওর কানে গেল কে বলছেন (কর্তা-ব্যক্তিদেরই কেউ) 'প্রত্যেকটি এষ্টিমেট ছাড়িয়ে গেছে খরচা! এই ধরোনা ডেকোরেশনই, আমরা ধরেছিলুম ছশো—পড়ল পুরো নশোটি টাকা।···খরচার কথা আর ব'লো না—'

রসুন-চৌকীতে মিঠে সুর বাজে, বাতাসে ভেসে আসে নানা সুখাদ্যের

বিচিত্র, মিলিত একটা গন্ধ। ওপরের বারান্দায় বারান্দায় সুবেশা সুন্দরীর দল, তাদের অবিরাম ফিস্‌ফিসানি চলেছে ওকে উপলক্ষ্য করেই! অর্থাৎ আজকের এই জমাট নাটকের নায়ক হ'ল সে-ই। এই অজস্র অর্থব্যয়, এই উৎসব সমারোহ, এই আনন্দ ও হাসির উৎস—এর মূলে প্রভাতেরই বিবাহ।

নেশা লাগে প্রভাতের। সব দুশ্চিন্তা কোথায় ভেসে চলে যায়।......

এই নেশার ঘোরটা লেগেই থাকে। বৌ সুন্দরী, অন্তত প্রভাতের তাই মনে হয়! মনে হয় ওর জীবন ধন্য, সার্থক হয়ে গেছে। তাই খরচের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ করে না। ফুড কন্ট্রোলের দোহাই দিয়ে নিমন্ত্রণের ফর্দ কমানো হয়েছিল, তবুও দেড়শ'য় গিয়ে দাঁড়াল। এ ছাড়া কন্যাপক্ষ আছেন। তা হোক, কিন্তু বৌভাতের পরেও খরচের জের যেন কমে না—আসা-যাওয়া নতুন কুটুম্বদের, পাড়ার লোকদের। ওর শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া ইত্যাদি সবই বায়-বহুল। উৎসবের সুর লেগে থাকে মা ও বোনের মনেও, খরচের হাত কমাতে পারেন না। মা বলেন 'রক্ষে কর্ বাপু, চিরদিনই ত দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে কাট্‌ল—এই দুটো দিন একটু আমোদ করতে দে!'

'দুটো দিনের আমোদ' অর্থাৎ বিয়ের আটদিন কাটিয়ে বধূ যখন পিত্রালয়ে গেলেন মাসখানেকের জন্য তখন প্রভাত হিসেব করতে বসে প্রথম চমকে উঠল। আড়াই হাজার টাকার মধ্যে আছে ওর হাতে মোট তিনশ'টি টাকা। তাও এদিক ওদিক থেকে কিছু কিছু টাকা পেয়েছিল প্রভাত (বিদেশ থেকে আত্মীয় স্বজনরা পাঠিয়েছিলেন পাঁচ দশ করে—যৌতুক হিসেবেও এখানে নগদ পাওয়া গিয়েছিল—), সব জড়িয়ে একশ'র কম নয়, তারও আর চিহ্ন নেই। উল্‌টে খুচরো বাজার-দেনা যে

কোথা থেকে কি করে গজিয়ে উঠছে এখনও—আশ্চর্য! এসব মনেও থাকে না, হিসেবেও ধরা যায় না—

মুখ শুকিয়ে যায় প্রভাতের। ওপরের ঘর সুদুরপরাহত। এখন ওপরে একটি মাত্র ঘর, তাইতে প্রভাত শোয়। নিচের দুটো ঘরের একটাতে মা ও বোন থাকেন, বাইরের ঘরটাতে ভায়েরা শোয়। অন্য বোনেরা এলে, থাকে মধ্যে মধ্যে। এ অবস্থায় ভাড়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ ব্যয় বাড়ল—আয় বাড়ল না।

তার ওপর মা এমন বোকা, সেদিন বৌয়ের সামনেই বলছেন, 'অনেকগুলো ত খুচরো টাকা পেলি যৌতুকের—ওগুলো দিয়ে বৌমাকে যাহোক্ একটা কিছু গড়িয়ে দে, তবু জিনিসটা থাকবে—'

ফলে ইতিমধ্যেই নববধূ আশালতা দুদিন তাগাদা করেছে।

উঃ, বাজে খরচ কি কম হ'ল! প্রভাত মনে মনে হিসাব করে, এই কদিনে জল-খাবারই এসেছে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকার। অথচ ফুলশয্যাতে ওরা এগারো থালা মিষ্টি পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে চার থালাই ছিল বিয়ে উপলক্ষ্যে ঘরে-করা পান্তুয়া দরবেশ সন্দেশ—বর্ষার দিন, এরই মধ্যে একটু গন্ধ হয়ে এসেছিল। বাকী যা নারকেল বা ক্ষীরের খাবার, তাও থাকবার নয়, ফলে মা সব মিষ্টিই বাড়ী বাড়ী বিলোলেন পাড়ায়। অভ্যাগতরা হাঁড়ি ভরে নিয়ে গেলেন—মায় ওদের বৌভাতের যা মিষ্টি বেঁচেছিল, তাও। একটাও বাঁচিয়ে রাখা গেল না।

ফুলশয্যা ওরা নাকি ভালই পাঠিয়েছিল। মা সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন কদিন ধরে—সাতাশ জন লোক দিয়ে পাঠিয়েছে। বিস্তর জিনিস। দেখে সেদিন প্রভাতেরও কম আনন্দ ও তৃপ্তি হয়নি। কিন্তু আজ ওর মনে হচ্ছে, কেন? কী দরকার ছিল? কাপড় জামা আর

কমা ও সেমিকোলন

কোন্ জিনিসটা কি কাজে লাগবে? ও বাড়ীতে মেয়ে-জামাই যা যৌতুক পেয়েছিল, নানাবিধ সস্তার চকচকে জিনিস—সেইগুলোই ট্রে ভরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, দু'তিন জন লোক লেগেছে বয়ে আনতে। ফলে প্রভাতের ছ'টি টাকা বাজে খরচ হয়ে গেল সেই তিন জনের বিদেয় দিতে। বাজে খরচা বৈকি! কী কাজে লাগবে প্রভাতের অতগুলো দোয়াতদানি, নিকেলকরা টি-সেট বা আইসক্রিমের কাপ?

এই তত্ত্বের যা খরচা, টাকাগুলো নগদ পেলে প্রভাতের কাজে দিত।

একমাস পরে আশালতা ফিরল।

বোন পূর্ণিমা এসে বলে, 'দাদা, টাকা দাও ঘি আনাতে হবে।'

'ঘি? সে কি! এই ত বললি বৌভাতের দরুণ—'

'ব'লো না আর। তরকারীতে দেবার জন্য আধসের ঘি আনিয়েছিলে! তবু ভেজিটেবল ঘি খানিকটা বেঁচেছিল বলে এধারে ক'দিন জলখাবার-টাবার চলল—আর কতদিন হবে?'

'তা ঘি কি হবে?'

'বা রে, বৌদি আসছেন। জলখাবার চাই ত! আমরা না হয় রুটি খাই।'

'রেখে দে। সে-ও রুটিই খাবে—কী এমন নবাবের বেগম আসছেন!'

কিন্তু পরের দিনই পূর্ণিমা এসে বললে, 'দাদা, বৌদি ত কাল রুটি মুখে দিলে না। বললে খিদে নেই—পরে জেরা করে জানলুম যে ওদের রুটি খাওয়া কোনকালে অভ্যাস নেই।'

'অভ্যাস নেই—করুক! ভারি আমি কি করছি।'

মুখে বলে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা দুপাউণ্ড বনস্পতি ঘি এনে দেয়। টাকা গোনা গাঁথা—এটুকু খরচ করতেও লাগে।

কমা ও সেমিকোলন

আশালতা দিন-কতক পরে বলে একদিন, 'মা বুড়ো মানুষ কতকাল রঁাধবেন বলো দিকি, একটা রঁাধবার লোক রাখোনা !'

'মা রঁাধেন কেন—পুনি ত আছে !'

'ব'লো না ! ঠাকুরঝি আইবুড়ো মেয়ে—একেই ময়লা, রোজ রোজ আগুন-তাতে গিয়ে কেলেকিষ্টি হয়ে যাক্—তারপর ? পার করবে কি ক'রে ?'

'আমার মা চিরকাল দুবেলা হাঁড়ি ঠেলছেন, ওঁর এখনও গায়ের রং দেখেছ ? রঁাধলে রং কালো হয়, কে বলেছে এ কথা ?'

'সে ফরসা লোকদের কথা আলাদা। ময়লারা সহজেই কালো হয়। তাছাড়া কোন্‌দিন হাত-পা পোড়াবে, কি করবে—'

'অত দরদ যদি ত নিজে রঁাধলেই পারো। তুমি ত পার হয়ে গেছ—'

আষাঢ়ের মেঘ নামে যেন আশালতার মুখে। কিছুক্ষণ মুখভার ক'রে বসে থেকে অভিমানাহত মুখে বলে, 'সে উপায় থাকলে কি আর তোমাকে বলতে হ'ত ? সেটুকু বিবেচনা আমার আছে ! কী করব, ভগবান স্বাস্থ্যটা এমন করেছেন উনুনের ধারে গেলেই মাথা ধরে। আর সে ত যে-সে মাথা-ধরা নয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে একেবারে !'

প্রভাতেরও বুকের মধ্যেটা যেন হিম হয়ে আসে, 'কৈ, একথা ত বলোনি কোনদিন ?'

'কথা ওঠেনি তাই বলিনি। নইলে কি মিছে কথা বলছি হঠাৎ ?'

অভিমানে আশালতার চোখে জল এসে পড়ে। সে দ্রুত উঠে যায় সেখান থেকে।······

আশালতা একদিন ভোরবেলা প্রশ্ন করে অকস্মাৎ, 'আচ্ছা, তুমি বাজারে যাও না কেন ? আজ যাও !'

কমা ও সেমিকোলন

'কেন বলো ত ?' কণ্ঠস্বর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে প্রভাতের।

ওর পিঠে মুখটা গুঁজে আশালতা বলে, 'ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, মোটে গুছিয়ে বাজার করতে পারে না। রোজ রোজ কচি পোনা নয়ত কুঁচো চিংড়ি—মুখে যেন অরুচি ধরে গেল !'

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সে দোষ বাচ্চুর নয় আশা, সে দোষ আমার পকেটের। কাটা-পোনাই বলো আর যে-কোন ভাল মাছই বলো, সাড়ে তিনটাকার কম নয়—একপো মাছ কিনতেই ত চোদ্দ আনা চলে যাবে—ওকে ত বাজার করতে দিই মোটে দেড়টি টাকা !'

'মোটে দেড়টাকা দাও ? কী সর্বনাশ ! আমাদের বাড়ী পাঁচ টাকা, তাই কুলোয় না সব দিন। অন্তত দু'টো ক'রে টাকা দিও, নইলে পারবে কেন ?'

'মাস গেলে দুশো আটটি টাকা হাতে পাই।···আর রোজ দুটো ক'রে কাঁচা বাজারে দিলে ঐখানেই ষাট টাকা বেরিয়ে যাবে। তারপর ? হাঁড়ি চিবিয়ে থাকব ?'

'তা রেশন আর কটা টাকা ?'

'তোমার কি বিশ্বাস'—প্রভাত ওর দিকে ঘুরে বসে, 'বাজার আর রেশন ছাড়া কোন খরচা নেই ?'

'বলো কি খরচা, কাপড়চোপড় এক, তা ত আর ফি মাসে লাগছে না—'

'চুপ করো আশা। অত ছেলেমানুষ তুমি নও। সংসারের দিকে চেয়ে দ্যাখবার বয়স তোমার হয়েছে—' প্রভাত যেন অকারণে উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'ডাল, মশলা, তেল, ঘি, কয়লা, কাঠ, ঘুঁটে, কাপড়-জামা, বিছানা, ধোপা, নাপিত, মেথর, তেল সাবান স্নো, ট্যাক্স, ইলেকট্রিক, ইস্কুলের

মাইনে, বই খাতা পেন্সিল—কত রকমারী খরচা তার হিসেব রাখো? ঘুঁটে হয়েছে ছ' আনা শ, মাসে কত টাকার ঘুঁটে লাগে শুধু সে হিসেবটা মার কাছ থেকে নিয়ে এসো।'

'এত যদি খরচা ত আবার খরচা বাড়ালে কেন? বিয়ে না করলেই হ'ত—' রাগ ক'রে বলে আশালতা। অভিমানে কান্নায় ওর গলা বুজে আসে।

'বিয়ে করেছি সংসারে খাটবার লোক চাই ব'লে। নবাবের মেয়ে ত আর বিয়ে করিনি।'

'নবাবের মেয়ে না হই—এত অভাবে আমরা মানুষ হইনি। সে বুঝে আনা উচিত ছিল।'

'আমি যে কী দরের লোক তা-ত তোমার বাবা জানতেন। আমি সেধে বিয়ে করতে যাইনি, তিনিই সেধে এসেছেন আমার কাছে। আমার কাছে আমার মত চলতে হবে।'

রাগ ক'রে উঠে চলে যায় প্রভাত। আশালতা বসে বসে কাঁদতে থাকে। অকারণে এমন সুন্দর সকালটা মাটি হয়ে যায়। এরই মধ্যে তুচ্ছ বাজার-খরচের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হবে তা কে ভেবেছিল?

সারা দিনটাই বিশ্রী কাটে প্রভাতের। রাত্রে গিয়ে আশালতার মান ভাঙাতে হবে মনে ক'রে ও একটুও শান্তি পায় না।

বিয়ের আগেও বোনের বা মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি হ'ত বৈকি।

মাসকাবারে ভাঁড়ার নিঃশেষ হয়ে থাকত, পোসরা তারিখ সকালেই অসংখ্য দাবী পেশ করতে হ'ত ওর কাছে। প্রভাত প্রত্যেকবারই

কমা ও সেমিকোলন

অপ্রসন্নমুখে ঐ এক অনুযোগ করত, 'তোদের কি আয় রাত পোয়াতে তর্ সয় না রে !···কী রকম সংসার করিস তোরা যে পয়লা তারিখে একটা কিছু থাকে না !'

অথচ মাস-কাবারী বাজার যা করত, তাতে ছাব্বিশ সাতাশ তারিখেই সব শেষ হয়ে থাকৃত—বাকী চার পাঁচটা দিন যে কি করে কাটাত ওরা তা ওরাই জানে। প্রত্যেকটি দিন এবং রাত্রি অনমনীয় দৃঢ়তার একটা ইতিহাস, অভাব ও দারিদ্র্যের কাছে মাথা না নোওয়াবার একটা কঠিন সংকল্প ও অবিশ্রান্ত যুদ্ধের কাহিনী।

আয় তাই আছে, ব্যয় বাড়াবার আর কোন উপায় নেই, অথচ মানুষ একটা বেড়েছে গোটা। তার রকমারী খরচা। কাপড় জামা কিংবা প্রসাধন-দ্রব্য এখনও কিনতে হয়নি, কিন্তু খাওয়া জলখাবার ত আছে !

আবার শুরু হয় আগের মত কচ্‌কচি। মাসকাবারে পুনির সেই বাধ্য হয়ে হাত-পাতা এবং প্রভাতের সেই অকারণ অসন্তোষ! মাসের শেষে কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে সংসার চালানো—

ওদের দারিদ্র্যের নগ্ন রূপটা আশালতার সামনে ফুটেই ওঠে ধীরে ধীরে। সে-ও কোন রকমে, বাধ্য হয়েই নিজেকে ওর ভেতর সইয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মন যায় বিষিয়ে, তিক্ত বিরক্ত হয়ে। নব-দম্পতীর জীবনে উচ্ছল আনন্দরসধারার উৎস কোন্ রুদ্র দেবতা যেন শুষ্ক ক'রে তোলেন।

তবু, সেই তিনশ' টাকার ভাণ্ড থেকে কোন্ অলক্ষ্য ফুটোয় কিছু কিছু করে ঝরে পড়ে যায় ! অর্থাৎ বাধ্য হয়েই প্রভাতকে তা থেকে কিছু কিছু খরচ করতে হয়।

কমা ও সেমিকোলন

আশালতা বলে, 'কৈ গো, ওপরে ঘর করলে না? তাই বলেই ত বাবাকে চাপ দিয়ে অতগুলো টাকা আদায় করেছিলে!'

তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে উত্তর দেয় প্রভাত, 'জেনে শুনে ন্যাকামি করো কেন? কত টাকাই বা তোমার বাবা দিয়েছিলেন—বিয়েতেই ত সব খরচ হয়ে গেল। কিসে কি হয় দেখছ না?'

'বাবাই বা আর কোথায় পাবে?' সতেজে উত্তর দেয় আশালতা, 'বাবারই কি খরচাটা কম হ'ল! নিজেই ত' খরচ করে দেখলে কিসে কি হয়! পুরো দশটি হাজ'র টাকা খরচ হয়ে গেছে!'

প্রভাতের কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপ ফুটে ওঠে, 'সুন্দর! দশ হাজার টাকা খরচ হ'ল কিন্তু জামাই পেলে মোটে আড়াই হাজার টাকা!...আর মেয়ে বারো ভরি সোনা, খুব বেশি হলেও চৌদ্দশ—খাট বিছ'না আলমারী বরাভরণ দেড়হাজার ধরি। দশহাজারের মধ্যে সাড়ে পাঁচ পেলুম ধরো—বাকী সাড়ে চার হাজারই বাজে খরচ!'

আশালতা ভুল বোঝে। সে ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে ওঠে, 'তুমি ত অবিশ্বাস করবেই! জানো, শুধু ডেকোরেশনেই খরচ হয়েছে হাজার টাকা?'

'ক্রিমিনাল!... কেন, ও থেকে পাঁচশ টাকা বাঁচিয়ে আমাকে বেশি দেওয়া যেত না? মনে আছে তিন থেকে আড়াই করার জন্য কী কাণ্ড করেছিলেন তোমার বাবা! জামাইকে দিতেই বড় প্রাণে লাগে, না? ডেকোরেশন-ওলা তার চেয়ে ঢের বেশি আপন!'

'বেশ বেশ, আমার বাবা ছোটলোক, আমার বাবা কৃপণ! আর তোমরা খুব ভাল, খুব ভদ্রলোক, খুব মহৎ! হয়েছে ত?'

দুম্ দুম্ করে পা ফেলে নিচে নেমে যায় আশা।

কমা ও সেমিকোলন

মা এসে বলেন, 'হাঁরে, পূজোর কি করছিস্ ? আর ত মোটে আট দশ দিন বাকী।'

'তাতে কি ? কী করব ?'

'তত্ত্ব করবিনি ?'

'তত্ত্ব ত ওরা করবে !'

'ওমা, ঐ সুখেই আছিস বুঝি ! প্রথম বছর তোকেও ত তত্ত্ব করতে হবে। ওরা যেমন আমাদের বাড়ী সুদ্ধ সব দেবে, তোকেও ওদের বাড়ী সুদ্ধ দিতে হবে। এই প্রথম বছরটা যা, তারপর অবিশ্যি আর নয়।··· শুধু কি পূজোয়—শীতের তত্ত্ব আছে, দোলে—'

এসব কথা প্রভাত ভাল ক'রে শোনে না। ও মনে মনে হিসেব করে —শ্বশুর শাশুড়ী, দুই শালা এবং দুই শালী—হয়ত স্ত্রীকেও দিতে হবে একখানা !

তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত যেন কাঠ হয়ে আসে।

তবু একবার মরীয়া হয়ে বলে, 'ওসব আমি পারব না করতে—'

জিভ্ কেটে মা বলেন, 'সে কি রে ! এত নিলি, আবার হাত পেতে নিবি, আর উপুড়-হস্ত করবিনি সে কখনও হয় !'

'নিতেও চাইনা কিছু, পাঠাতে বারণ ক'রে দিও তত্ত্ব।'

'তা কখনও হয় রে ? পাগল ছেলে। বড্ড নিন্দে হবে যে। ঘরে বাইরে আর মুখ দেখাতে পারব না।

পাথর হয়ে বসে থাকে প্রভাত। কিন্তু উপায় যে নেই তা মনে মনে বুঝতে পারে নিঃসংশয়ে। অসহায়ের উন্মত্ত ক্রোধে যেন পৃথিবীটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতে ইচ্ছা করে ওর।···

এই ক'মাসে টাকাটা কমে দু'শতে দাঁড়িয়েছিল। যেমন তেমন ক'রেও

বাজার করতে তার পাই-পয়সা চলে গেল। তবু মিষ্টি শুধু ঘরেই যা তৈরী করা গেল—মোটে দু' রকম ব'লে মা খুঁত খুঁত করতে লাগলেন।

এক পয়সাও আর হাতে রইল না—অথচ পূজোর রকমারী খরচ আছে। প্রভাত কি পাগল হয়ে যাবে নাকি?

পূজোর পর একেবারে অগ্রাণ মাসের গোড়ায় ফিরল আশালতা; ওর বাবা-মার আশাভঙ্গ হয়েছে খুবই, তবু তাঁরাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে হিন্দুর মেয়ে, স্বামী ছাড়া পথ নেই—ঐ ঘরেই যেন সে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

আশালতাও প্রস্তুত হয়ে এসেছে এবার। স্বামীকে সে কিছুতেই তিক্ত হতে দেবে না। কিছুতে, কোন কারণেই সে ধৈর্য হারাবে না।

কিন্তু স্বামী কোথায়?

সকালে উঠেই কোথায় যেন বেরিয়ে যায়, ফেরে একেবারে পৌনে নটায়। তখন কোন-মতে দু'ঘটি জল মাথায় ঢেলে ভাতের থালার সামনে একবার বসবার সময় থাকে মাত্র। আর রাত্রে ফেরে কোন দিন সাড়ে আটটায়, কোনদিন নটায়।

প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে শুধু বলে, 'কাজ আছে' কিংবা 'কাজ ছিল।'

শনিবার দিন সকালে আশালতা ওর পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়—'আজ কিন্তু সকাল ক'রে ফিরতেই হবে তোমাকে, তা বলে দিচ্ছি।'

প্রভাত আবেগ-লেশহীন মুখে জবাব দেয়, 'সে ত সম্ভব নয় আশা ফিরব সকাল ক'রে ঠিকই কিন্তু আবার বেরোতে হবে সন্ধ্যার আগেই বিশেষ কাজ আছে।'

কমা ও সেমিকোলন

'ওগো, তোমার হুটি পায়ে পড়ি—কাজ থাক্। আজ পূর্ণিমার রাত। একটু লেকে যাবো। মাকে বলে কয়ে রাজী করিয়েছি।'

প্রভাত এইবার ওর দিকে পরিপূর্ণ ভাবে চাইলে। সে দৃষ্টি আগের মত শান্ত নয়—কোন্ এক উগ্র বহ্নি যেন জলে উঠেছে তাতে। উত্তর দেবার আগে অনেকক্ষণ ধরে ওর ঠোঁট-হুটো থর্ থর্ ক'রে কাঁপে।

অবশেষে সে কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়, 'লেকের জল আর চাঁদের আলো আমাদের জন্য নয় আশালতা, ওর চেয়ে চাল-ডাল-তেলের দাম ঢের, ঢের বেশি।...সকালে আর বিকেলে আমাকে হুটো টিউশনি করতে হয়। নইলে সংসার চলে না।...আজকাল মাঝে মাঝে রুইমাছও আসে, তা বুঝি লক্ষ্য করনি?'

পাশ ও ফেল

এমন কি, বিন্দের এক পিসতুতো দাদাও সেই কথা বললেন, 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন এগজামিন—পাশ করলেই বা কি, ফেল করলেই বা কি? ফেল করেছে তা কি হয়েছে? জীবন কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল? আসল জীবনে ওর মূল্য কতটুকু?' কিন্তু সে দাদা নিজে ইস্কুল-মাষ্টার, সুতরাং তাঁর কথাটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। জীবন সম্বন্ধে ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ঐ রকমই বিকৃত।

তবু ব্যাপারটা হাস্যকর বৈকি। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ছেষট্টি জনই যখন ফেল করেছে তখন অত মুষড়ে পড়ার কোন মানে হয় না। কী হয়েছে, এ বছর না হয় হ'ল না—আসছে বছরেই পাশ করবে—একটা বছর, এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি হবে না তাতে।

কিন্তু সেদিন যখন পরীক্ষায়-উত্তীর্ণদের ছাপা তালিকা এসে পৌঁছল তখন এসব কোন কথা বলেই ঐ তিনটি কিশোরকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না।

অবশ্য এক্ষেত্রে আগেই বলা উচিত, ওরা তিনজনেই ফেল করেনি। করেছে একা—বিন্দে বা বিনোদ। নরু আর পাগড়ী দু'জনেই পাশ করেছে, সসম্মানে খুব নয়—তৃতীয় বিভাগে। তা এ বছর সেটাও সোজা কথা নয়।

কিন্তু এটা ওরা আশা করেনি। ওরা তিনজনেই প্রায় সমান মেধা-

সম্পন্ন, চিরকাল একই রকমের মাঝারি রেজাল্ট্ করে এসেছে। তিনজনেই এক-একটা বিষয়ে ফেল করে ভাল করে তৈরী হবার মৌখিক মুচলেকা দিয়ে টেস্টে পাশ করেছে। সুতরাং ফেল করলে তিনজনেই করবে—পাশ করলেও তাই, এই ওরা জানত। অকস্মাৎ এ কী হ'ল?

বরং ফেল করবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল ওদের। অন্তত ওরা মনে মনে তাই জানত। এ বছর যে রকম সব ফলাফলের কথা শোনা যাচ্ছিল, আর হ'লও ত তাই, শতকরা চৌত্রিশ জন পাশ—তাতে ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল বহুদিনই; ভাল করে ঘুম হচ্ছিল না, ক্ষিধে চলে গিয়েছিল—নরু আর বিন্দের ত রীতিমত চোখ মুখ বসে গিয়েছিল শেষ ক-দিনে। এত কড়াক্কড়িতে কি আর পাশ করতে পারবে ওরা? বিশেষ ক'বে যে দুটি বিষয়ে বেশি ফেল করেছে বলে গুজব রটেছিল—ইংরেজি আর অঙ্কে, ওরা তিনজনেই সমান কাঁচা।

এ নিয়ে এই শেষ ক-দিন ওদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। কল্পনাকে যতদূর ছেড়ে দেওয়া যায়, মানসলোকের সেই সুদূর দিগন্ত থেকে নানা অসম্ভব চিন্তা ও প্রস্তাব এসে জড়ো হয়েছিল ওদের মাথায়। আচ্ছা,পালিয়ে গেলে কি হয়? কোথায়? যে-কোন এক জায়গায়। সেকালে নাকি অনেকে খালাসী হয়ে বিলেত চলে যেত,সেখান থেকে কেওকেটা হয়েফিরে আসত। ওরাও তাই যাবে নাকি? পাগড়ী (ভাল নাম শুভ্রাংশু) প্রস্তাব করেছিল, 'তা যদি তোদের মনে থাকে ত চল্ বোম্বে যাই। এখানে কোথাও থেকে কাজ খুঁজতে গেলে একদিন না একদিন ধরা পড়ে যাবো। তা ছাড়া বোম্বেতে জাহাজও বেশি, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে জাহাজ আসে। কোনও জাহাজে কি আর কাজ পাব না?'

বিন্দে তাড়াতাড়ি সংশোধন-প্রস্তাব এনেছিল, 'তিনজনকে কিন্তু এক

জাহাজে নিতে হবে ভাই, যে জাহাজ নেবে সেই জাহাজেই যাবো। তা নইলে এ যাবে কায়রো ও যাবে সিড্‌নী—সে বড় বিশ্রী!'

'তা ত বটেই' পাগড়ী ঘাড় নেড়ে আশ্বাস দিয়েছিল, 'তা নইলে যাবো কেন? শুধু তা নয়, যে জাহাজ ইংল্যাণ্ড যাবে সেই জাহাজেই চড়তে হবে। ওখানে শুনেছি বহু ছেলে চায়ের দোকানে রেস্তোরাঁতে চাকরী করে ইস্কুল কলেজে পড়ে। কত ছেলে গয়লার কাছে চাকরী নিয়ে সাইকেল-গাড়ী করে দুধ জোগান দিতে যায়—কেউ বা ভেজিটেব্‌লের গাড়ী নিয়ে ফিরি করতে বেরোয়। আবার গ্যাখো ব্রেকফাস্টের পর দিব্যি ফিটফাট, কলেজ স্ট্ুডেণ্ট। জানে সবাই, কিন্তু তা নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাসা করে না!'

'তাই নাকি?' বিন্দের মুখ প্রস্তাবটার অভাবনীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, 'তাই চ' তাহলে। একটা কোন কাজ কি আর পাবো না?'

ওদের ভেতরে নরুই একটু সংশয়বাদী, সে এতক্ষণ একটা নখ খেতে খেতে সব শুনছিল, সে বললে, 'কিন্তু সেখানে গিয়েই যে লেখা-পড়া হবে তার মানে কি? এখানকার এই সহজ অঙ্কই তোরা করতে পারিস না! তাছাড়া এখানে ত কোন কাজ নেই—সেখানে আবার চাকরী করে—'

''আরে সেখানে ত আর এই দিনরাত আড্ডা থাকবে না। তা ছাড়া তাদের পড়ানোর মেথড্‌ কত ভাল তা জানিস? আমার মেজদার এক বন্ধুর পিসতুতো ভাই এখানে সব সাবজেক্টে গোল্লা পেত, কিন্তু ওখানে—'

পাগড়ী অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

কিন্তু নরু আরও ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয় ওদের ঘাড়ে, 'তা ত হ'লো আপাতত বোম্বে পর্যন্ত যাওয়াটা হবে কি করে—পকেটের অবস্থা কার কি রকম?'

এ ধরণের সংশয়বাদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই একটু চুপ

করে ছিল কিছুক্ষণ। শেষে বিন্দেই বলেছিল, 'আমরা কি আর টিকেট কেটে যাবো ভেবেছিস? এমনি বোম্বে মেলে চড়ব, যেখানে কেউ ধরবে নামিয়ে দেবে—নেমে পড়ব। আবার পরের ট্রেণ ধরব। এমনি করে একদিন পৌঁছে যাবো। সঙ্গে ত কিছু থাকবে না, এক কাপড়ে যাবো—যেমন হাফ্-প্যাণ্ট আর হাফ্-শার্ট পরা থাকে তেমনিই—কী আর নেবে আমাদের কাছ থেকে? নামিয়েই দেবে বড়জোর! চাই কি, ছেলেমানুষ দেখে ছেড়েও দিতে পারে। ঐ ত পালেদের বড় খোকা, ঐ করে বোম্বে দিল্লী সব ঘুরে এল!'

'তারপর? খাবে কি?'

'ও, সে হয়ে যাবে।' পাগড়ী গলায় জোর দেয়, 'আমাব হাত-ঘড়িটা আছে, তোর কলম—এগুলো ওখানে গিয়ে বেচে দেওয়া যাবে'খন।'

বিন্দে তাড়াতাড়ি বলে, 'বাড়ী থেকে কেউ এক পয়সাও নেব না কিন্তু। আমার নিজস্ব পাঁচটা টাকা আছে ছোড়দির কাছে, ভাঁওতা দিয়ে সেইটে বার করে নিতে হবে। পৈতের সময় যা পেয়েছিলুম তার ঐ পাঁচটাই আছে আর বাকি।'

'তবে আর কি! গ্র্যাণ্ড হবে।' পাগড়ী লাফিয়ে ওঠে।

নরুও অবশিষ্ট নখ খেতে খেতে সায় দেয়, 'মন্দ না। তাহ'লে একটা কিছু করা হয় বটে।'

এ ওদের অসংখ্য পরিকল্পনার একটা মাত্র—নমুনা!···কোনদিন স্থির হ'ত যে টাটায় গিয়ে ওখানকার কারখানায় য়্যাপ্রেন্টিস্‌শিপের চেষ্টা করা হবে। কোনদিন বা কথা উঠত দিল্লী বা বোম্বাইয়ে গিয়ে কোন হোটেল রেস্তোরাঁতে 'বয়ে'র কাজ নিয়ে কিছু টাকা জমিয়ে কোন ব্যবসা খোলা হবে। একবার এমন কথাও উঠল যে, নরুর কাকাবাবু পশ্চিমের কোন্

এক জায়গায় খানিকটা জমি কিনে ফেলে রেখেছেন—সেখানে গিয়ে ওরা চাষবাস করবে—যদি ওদের বাড়ীর লোকেরা প্রাথমিক অর্থসাহায্যটাতে রাজী থাকে।

এমনি অসংখ্য কল্পনা ও প্রস্তাব। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই মূল সুর হ'ল এই যে—ফেল করলে বাড়ীতে আর থাকা হবে না। বাইরে যেখানে-হোক গিয়ে যা-হোক কিছু-একটা করতে হবে। পড়বে ওরা ঠিকই—আর-একবার পাশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বাড়ীতে বসে আর নয়। বাড়ীর টাকা খরচ করার অগৌরব থেকে নিজেদের রক্ষা করা চাই।

'কেন না—' নরু ওদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'ছাখ, এই যে এখন দিনরাত তিনজনে আড্ডা দিচ্ছি, পরীক্ষার সময় দিনরাত তিনজনে পড়েছি, হ্যাঁ (পাগড়ীর মুখের ক্ষীণ হাসি লক্ষ্য করে)—আড্ডাও দিয়েছি বৈকি সে সময়, একটানা কি আর মানুষ পড়তে পারে—সে যাই হোক, এই তিনজনে এক সঙ্গে থাকাটা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ ফেল করলে ত আর এমন করে আড্ডা দিতে পারব না, তখন বাড়ী থেকে বেরুতেই লজ্জা করবে, মুখ দেখাবো কি করে? এক সঙ্গে বসে পড়াও চলবে না, কেননা তাতে দুজনকে বাকী একজনের বাড়ী যেতে হবে—সে অসম্ভব! বাড়ীতে বসে একা একা পড়া, সে ভাই কিছুতেই হবে না—প্লেন কথা।'

অবশ্য বিন্দেই একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিল—'ভাই, বাইরে গিয়ে যদি কিছু না হয়, ফিরে আসতে বাধ্য হই, সে বড় লজ্জার কথা হবে। তার চেয়ে বরং চোখ-কান বুজে কটা মাস কাটিয়ে আর একবার পরীক্ষা দেওয়াই ভাল।'

'দূর! সে আর সম্ভব নয়!' পাগড়ী কথাটা উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনাটা নিয়েও ওরা পরে আলোচনা করেছে। হয়ত তাও

হ'ত শেষ পর্যন্ত। হয়ত তিনজনেই কিছুদিন চুপচাপ বাড়ীতে বসে থেকে একটু একটু করে লজ্জাটা ভেঙে একদিন আবার পুনর্মূষিক হ'ত। তবে সে যখন হ'লই না—তখন কী হ'ত তা বলা শক্ত।

ফেল করার পরের অবস্থাটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলেও পাশ করার একটা সুদূর সম্ভাবনা, একটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা ওদের মনের মধ্যে ছিল, এটা ঠিক। এবং তা নিয়েও কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা ওরা করেছিল।

তবে বেশি কিছু কল্পনা করতে সাহস করেনি। তার কারণ—উঃ, সে অবস্থাটা যেন ভাবা যায় না!

পাগড়ী বলেছিল, 'আমরা ভাই প্রথম খানিকটা প্রাণভরে চেঁচাব, তা কিন্তু বলে রাখছি।'

নরু বলেছিল, 'তা চেঁচাস—মোদ্দা খুব খানিকটা লাফাবো আমি, হয়ত ডিগবাজীও খেতে পারি।'

শুধু বিন্দে বলেছিল, 'ছ্যস! তা কেন? আমবা বরং খুব গম্ভীর হয়ে থাকব—উদাসীন হয়ে, যেন আমরা জানতুম যে পাশ আমরা করবই, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?'

নরু জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ—তা করলে মন্দ হয় না বটে, কিন্তু সে হয়ত ভাই পারব না শেষ অবধি। আনন্দ কি আর চেপে রাখতে পারব?'

এসব উচ্ছ্বাসের ফেনা কাটিয়ে যে প্রোগ্রামটা দাঁড়িয়েছিল, তা সংক্ষেপে এই: প্রথম দিন খবর পাওয়া মাত্র ওরা পাড়ার মধ্যেই খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে বেড়াবে, তারপর সবাই মিলে বাস্-এ চেপে সমস্ত বিকেল ও সন্ধ্যাটা ঘুরবে। পরের দিন তিনটে থেকে ন'টা এক নাগাড়ে সিনেমা

দেখবে—রাত বারোটায় হেঁটে বাড়ী ফিরবে চৌরঙ্গী দিয়ে। আর সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামটা তোলা থাকবে পনেরই আগস্টের জন্য। সেদিন ওরা, অর্থাৎ এ-গলির যে ন' জন ম্যাট্রিক দিয়েছে, তার মধ্যে যারা পাশ করবে তারা, ভোরবেলা প্রচুর খাবার ও ফ্লাস্কে চা নিয়ে বেরোবে সাইকেলে, সোজা ডায়মণ্ড হারবার গিয়ে পিকনিক করবে। তারপর আবার সাই-কেলেই ফিরে সন্ধ্যাবেলা একখানা জিপ গাড়ী সংগ্রহ করে বেবোবে আলো দেখতে।—এই ব্যবস্থাটাই শেষ পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মত হয়ে টিকে ছিল।

কিন্তু এ ঘটনার জন্য ওরা কেউই প্রস্তুত ছিল না। সকালবেলা পাগড়ীর দাদা কলকাতায় গিয়ে যখন পাশ-করা ছাত্রদের ছাপা তালিকাটা কিনে নিয়ে এলেন, তখন ওরা বিন্দেদেরই দোতালার একটা ঘরে বসে। ওর দাদাকে ডাকতে শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাঁর হাতে তালিকা এবং তাঁর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত মুখ দেখে পাগড়ী লাফাতে লাফাতে নেমে এল, 'কী হয়েছে দাদা? তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, তুই পাশ করেছিস—থার্ড ডিভিশনে।'

পাগড়ী আর দাঁড়ায়নি। ওটা নিয়ে ওপরে চলে এসেছিল তখনই। কিন্তু 'তুই' শব্দটা ওর কানে খট্ করে বেজেছিল। তাই ওপরে ওঠার সময়ই ওর গতি হয়ে এসেছিল মন্থর, ওর বুক কাঁপছিল কি-একটা অজানা আশঙ্কায়। তবে কি ওরা—না নরু শুধু? না কি ওটা দাদার বলবার একটা ভঙ্গী মাত্র? উনি ওদের নম্বর জানেন না বা দেখেননি!

সেটার মীমাংসা হবার আগেই ও ওপরে পৌঁছে গেল। নরুর মুখ সাদা হয়ে গেছে তালিকাটা দেখেই, সে হাতটা বাড়াবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু হাতটা এমন থর থর করে কাঁপতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা

ছাড়তে হ'ল। সে তার চিরাভ্যস্ত নখ খেতেও পারলে না—অসহায় পাংশু মুখে চেয়ে বসে রইল। বিন্দে তো আগেই দুহাতে মুখ ঢেকেছিল। কিন্তু পাগড়ী নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েও খুলতে যেন সাহস পাচ্ছিল না। কী দেখবে কে জানে! হয়ত—হয়ত ওরা কেউই পাশ করেনি—

শেষে এগিয়ে এলেন বিন্দের ছোড়দি। পাগড়ীর হাত থেকে তালিকাটা নিয়ে এক পাতা এক পাতা করে নিজেই খুলতে লাগলেন। তখন ওরা তিনজনেই ভরসা করে ওঁকে ঘিরে ঝুঁকে পড়ল তালিকাটার ওপর।

প্রথমেই নরুর নম্বরটা চোখে পড়ল। আছে, তাহলে আছে ওদের নাম! আঃ, পাগড়ী নিশ্চিন্ত হল। ঐ ত, হ্যাঁ—কোন ভুল নেই, নরুরই নম্বর। পাশে তিন। এবার বোধহয় সবাই থার্ড ডিভিশনে গেল।

নরু একটা অব্যক্ত আওয়াজ করলে মাত্র গলা দিয়ে। আনন্দিত বলুন, নিশ্চিন্ত বলুন—ও যা হয়েছে তারই একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু তখনও কৌতূহল বড়। অপরের কী হয়েছে না দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ঠিকমত।

তার দু'পাতা পরেই পাগড়ীর নম্বর—ঐ ত পাশে তিন!

হুর্‌রে! তাহলে পাগড়ীর আশঙ্কা অমূলক। ওটা ওর দাদার বলবারই ভঙ্গী। এইবার শুধু বিন্দেরটা দেখলেই হয়। আরও পৃষ্ঠা-দুই পরে ওর নম্বর পাওয়া যাবে—

কিন্তু কই? ওর আগেরটা আছে, পরেরটাও আছে, কিন্তু সেই বিশেষ নম্বরটি? তবে কি ওদের দেখতেই ভুল হচ্ছে? না—নেই ত!

ছোড়দি তাঁর শুকনো ঠোঁট দুটোয় একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মুখে বেশিরভাগ উদ্বেগ—কিছু অবিশ্বাস। বিন্দের মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে—

না। সত্যিই নেই।

বিন্দে দুহাতে মুখ ঢেকে পাশের 'সেটি'টায় বসে পড়ল। পাগড়ী আর নরু দুজনে দুটো জানলায় গিয়ে বসল। শুধু ছোড়দি সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘরে অসহ একটা স্তব্ধতা। সে নিঃশব্দতা কল্পনা করা যায় না। ছোড়দির ছোট্ট হাতঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজও যেন কান পেতে থাকলে শোনা যায়। আর শোনা যায়, পূবে বাতাসে ওপাশের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারটা উড়ছে, তারই খস খস আওয়াজ।

শেষে ছোড়দিরই সম্বিৎ ফিরে এল আগে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিন্দের পাশে এসে বসলেন, আস্তে আস্তে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন।

বিন্দে কথা কইল না। মুখও খুলল না—তেমনি কাঠ হয়ে বসে রইল। ছোড়দির আশঙ্কা ছিল হয়ত ও কেঁদেই ফেলবে—কিন্তু তেমন কিছুও ঘটল না।

বিন্দের মা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁরে নরু, পাড়ার ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, রেজাল্ট বেরিয়েছে না কি ? কী হ'ল রে তোদের ?'

নরু আর পাগড়ী দুজনেই কাঠ। কী উত্তর দেবে ওরা ?

'কী রে, সবাই চুপচাপ কেন ? সবাই ফেল নাকি ?' মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

ছোড়দিই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, 'ওরা দুজনেই পাশ করেছে মা, খালি বিন্দে ফেল করেছে—'

একটা নিশ্বাস ফেলে মা শুধু বললেন, 'আমারই অদৃষ্ট। আর কি বলব বলো।'

কমা ও সেমিকোলন

পাড়ায় অনেকগুলি ছেলে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল। এই গলি থেকেই ন'জন। তাদের মধ্যে পাঁচজন পাশ করেছে। পাশের গলি থেকেও পাশ-করা জনতিনেক এসে জু'টছে। তাদের মিলিত কণ্ঠের উল্লাস ক্রমশই উত্তাল হয়ে উঠছে। বিভিন্ন শব্দের সমষ্টি হয়ে সেটা কোলাহলে রূপ নিয়েছে। সেই শব্দগুলিকে যেন এ ঘরের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটি একটি করে বেছে নেওয়া যায়—

নরু নখ খাচ্ছে, পাগড়ী উস্‌খুস্‌ করছে। ওদের কাছে এ সংবাদ শুধু আনন্দদায়ক নয়, অভাবনীয়। ওরা ম্যাট্রিক পাশ করেছে, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না নিজেদের। সত্যিই এতক্ষণ লাফিয়ে বেড়াবার কথা। কিন্তু উল্লাসের সমস্ত উন্মত্ততা যেন একরত্তি বিন্দের নিস্পন্দ উপস্থিতিতে ঘা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

কে একটি ছেলে নরুদের বাড়ীর সামনে গিয়ে বিকট চীৎকার করছে, 'এই নরু, নরো, নরী—কী কচ্ছিস রে? ছোঁড়া কি এরই মধ্যে সিনেমায় ছুট্‌ল না কি?'

'পাগড়ীটা গেল কোথায়? এই পা-গ-ড়ী-ই-ই—' আর একজন চেঁচিয়ে উঠল।

কোলাহলটা ততক্ষণ খুব কাছে এসেছে। পাগ্‌ড়ীদের বাড়ী বিন্দেদের পাশেই।

কে একজন যেন বলে উঠল, 'এই, ওরা বোধ হয় বিন্দেদের বাড়ী—'

'ও, তাই নাকি?' মুহূর্তের মধ্যে যেন উথলোনো দুধে জল ঢেলে দিলে। মিনিট-খানেকের জন্য সমস্ত উন্মত্ততা শান্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। সেই এক মিনিটের জন্য বিন্দে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারল না—অথচ

একটা তীব্র বেদনাও। এই সহানুভূতির মধ্যেও একটা অপমান আছে যে!

নরুদের বাঁচালেন ছোড়দি।

দোরের কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'এই, তোরা যা, বাড়ীতে একবার দেখা করে আয়—'

'যাচ্ছি।' খুব নিরুৎসাহ এবং নিস্পৃহ কণ্ঠেই বলে ওরা। এবং যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে এক সময়ে নিঃশব্দে উঠে যায়।

বিন্দে উঠল না। কিন্তু খালি ঘরে মুখ থেকে হাতটা নেমে গেল আপনিই। ও যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে জানলার পর্দার নিচে দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায়। নরু আর পাগড়ী গিয়ে দলে মিশে গেল। আনন্দের উচ্ছলতা নেই ওদের মধ্যে, কারণ বিন্দে জানে যে, এ আঘাতটা ওদের আন্তরিক। তবু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে বৈ কি! একটু পরেই নরুর চিরাভ্যস্ত হাসি শোনা যায়—হা-হা-হা!

কত কি তর্ক এরই মধ্যে। কত কি চেঁচামেচি। কারা ফেল করেছে, তাদের মধ্যে কার কার ফেল করা উচিত হয়নি—কার দুটো মাস্টার ছিল, কে ছ'মাস কোচিংএ পড়েছে তার আলোচনা। তাতে নিজেদের গৌরব আরও বেড়ে যায় আপনা থেকেই। তা ছাড়া সত্যকার সমবেদনারও অভাব নেই অবশ্য ওদের মধ্যে।

কোলাহলটা আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। ওরা ক্রমশ ভুলে যায় বিন্দের অস্তিত্ব। বহু দিনের বহু প্রতীক্ষার পর এই সাফল্য। বহু সাধনার ধন এ। বহু কল্পনায় মাখা ভবিষ্যৎ-জীবনে প্রবেশাধিকার। চেষ্টা করেও ওরা শান্ত থাকতে পারে না।······

এ গলি পেরিয়ে ওরা ও-পাশের গলিতে যায়। আরও ছেলে এসে

জোটে। আরও হৈ-হল্লা। শেষে সম্বিৎ ফিরে আসে নরুরই। সে পাগড়ীকে একটা খোঁচা দিয়ে বাকী ছেলেদের দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত মাত্র করে চলে আসে।

পিছনে শুনতে পায় কানু বলছে, 'তা বিন্দেটা ঘরের মধ্যে বসে আছে কেন? ফেল করেছে বেশ করেছে—কার কী? বেরিয়ে আসতে বল্ না। ঐ তো মাস্তাও ফেল করেছে, ছাখ্ দিকিনি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী হয়েছে, না হয় আসছে বছর হবে—'

নরু মুখ ফিরিয়ে শুধু বললে, 'জানিস ত বিন্দেকে, ও অমন দুকান-কাটা হতে পারবে না কোন দিনই—'

আবারও ওরা দুজন বিন্দের কাছে এসে বসল। বিন্দে তেমনিভাবেই বসে আছে, তবে হাতটা আর মুখে চাপা নেই, স্থির দৃষ্টি মেঝেতে রেখে মাথা হেঁট করে বসে আসে—

তিনজনেই চুপচাপ। ওদের ব্যথা লেগেছ সত্যিই। সাধারণ সহপাঠী হলে হয়ত এতটা লাগত না। ওরা এক ইস্কুলে পড়েওনি, নরু আর পাগড়ী গেছে থার্ড ক্লাস থেকেই আলাদা হয়ে অন্য ইস্কুলে—বিন্দে যায় নি। কিন্তু এক গলিতে পাশাপাশি সামনাসামনি বাড়ি, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে বাল্যকাল থেকে। তবু সেটাও বড় কথা নয়—গত বছর হাফ-ইয়ার্লিতে তিনজনেই খুব শোচনীয় রকমের ফলাফল করায় হঠাৎ ওরা স্থির করে যে, ওরা তিনজনে একসঙ্গে পড়বে। এতে যতটা পড়া হয়েছে হয়ত ততটাই আড্ডা হয়েছে কিংবা আরও বেশি, তবু পড়াও কিছু হয়েছে, কারণ এই তিনজনেরই পড়ার কিছু ইচ্ছা ছিল—বাকী যা দল, তাদের আড্ডায় যে সব

কমা ও সেমিকোলন

প্রসঙ্গ ক্লাস টেন-এ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেছে, সে দলে পড়ে আড্ডা দিলে সেটুকু পড়াও হ'ত না হয়ত।

কিন্তু পড়া যত না হোক—অন্তরঙ্গতাটা খুব নিবিড় হয়েছে। তারপর টেস্ট—টেস্টের পর আবার উদ্যোগপর্ব। আরও নিবিড় হয়েছে সাহচর্য—দিন রাত। সকাল দুপুর সন্ধ্যা—পালা করে এক একজনের বাড়ীতে কেটেছে ওদের একসঙ্গে। এমন কি, ঘুমিয়েছেও একত্রে, এক শয্যায়।

তারপর আবার এই চার মাস অনাবিল আড্ডা। নরুর বিদেশভ্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে যায়নি, এদের ছেড়ে যেতে হবে বলে। অবশ্য ওরা এবার বৃহত্তর দলেও মিশেছে—ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর হঠাৎ বালকেরা যে সব মন্ত্রে কিশোর, এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে তরুণ হয়ে ওঠে, সে সব মন্ত্রও নিয়েছে ওরা। বহু নিষিদ্ধ ক্ষেত্রের দ্বার খুলে গেছে ওদের সামনে, এই চার মাসের অনেক অনভিপ্রেত সাহচর্যে। তাতে ওদের কাঁচা মন টলমল করছে কৌতুকে ও কৌতূহলে। লোভে ও বিতৃষ্ণায়, ভয়ে ও আগ্রহে। ওদের ভাল লাগেনি সে সব সঙ্গ, তবু ছুটে ছুটে গেছে—আস্বাদ করেছে জীবনের কটু মিষ্ট বিষ-স্বাদ।

কিন্তু নরুদের সম্বন্ধে এটা তবুও প্রযোজ্য—ওরা একেবারে নিজেদের নিঃশেষ করে দেয়নি পাড়ার প্রবেশিকা-প্রবেশোন্মুখদের সেই বৃহত্তর দলটির কাছে, ওরা এই তিনজনে তিনজনকে নিয়েই থেকেছে বেশি। আশঙ্কা করেছে, আশা করেছে—ভবিষ্যতের সব রকম ছবিই এঁকেছে নিভৃত গৃহ-কোণে কিংবা লেকের নির্জন বেঞ্চে বসে বসে। পাশ করলে কি কি করবে এবং না করলে কি কি করবে তার সমস্ত তালিকাটাই বার বার আলোচনায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সে তালিকা তৈরি হয়েছিল এই

তিনজনের মধ্যেই; সে সব জল্পনা কল্পনার মধ্যে ওরা কখনও আর কাউকে ডাকেনি।

এমনি করে এই দীর্ঘ কয়েক মাসে এই তিনটি কিশোর তাদের মানস-লোকে যে সুখ-নীড় রচনা করেছিল, তা অকস্মাৎ রেজাল্ট-এর এই দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে চলে গেল। .....

ছোড়দি পাশে এসে বসলেন, খানিকটা চুপ করে থাকবার পর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি নিবি নরু, আর্টস্ না সায়ান্স্?'

চকিতে লাল হয়ে ওঠে নরু। তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে কথাটা চাপা দেয়, 'ও সব এখন থাক্ ছোড়দি—ও কথা একটুও ভাল লাগছে না।'

ছোড়দিও অপ্রতিভ হন।

আর খানিকটা চুপ করে থাকবার পর চঞ্চল নরুই কথাটা পাড়লে অবশ্য খুব মৃদুকণ্ঠে, 'ড্যাম্! ...কী যে হ'ল, সব যেন খিঁচড়ে গেল। কত প্ল্যান ছিল—'

পাগড়ীও তেমনি মৃদুকণ্ঠে সায় দিলে, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ডের প্রোগ্রামটা একেবারে মাটি হয়ে গেল!'

ছোড়দি বললেন, 'তা কেন—একজনের জন্যে সবাই কেন দুঃখ পাবি তোরা, তোরা যাস্—ও হয় ত যেতে রাজী হবে না, কিন্তু—'

'সে হয় না ছোড়দি', পাগড়ী বলে, 'পাড়ায় কেউ রাজী হবে না। বিন্দের জন্য আমাদের সমস্ত আমোদ মাটি হয়ে গেল। এ কি একটুও আনন্দ হচ্ছে আমাদের ভেবেছেন? এখন মনে হচ্ছে যে সবাই যদি ফেল হতুম ত ঢের ভাল ছিল। এক সঙ্গেই পড়তুম আবার, লজ্জাটাও ভাগ করে নিতে পারতুম!'

বাকী সমস্ত দিনটাই ওরা ওখানে বসে রইল। দিনের পর সন্ধ্যা,

সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা পর্যন্ত। ছোড়দি ওদের চা আর জলখাবা খাওয়ালেন জোর করেই। যদিচ বিন্দেকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না, এক কাপ চা-ও না।

বিন্দের দাদা এলেন সন্ধ্যার পর। কিছুক্ষণ বিষণ্ণ বিরস মুখে বসে রইলেন, একটু আধটু আলোচনা করলেন নরুদের সঙ্গে। ঈষৎ বাঁকা কথাও বললেন। তবে সেটা কত বড় দুঃখে বেরিয়েছে তা বুঝে নরুরা ওঁকে ক্ষমা করলে।······অবশেষে রাত দশটার পর ওরা দুজনেই উঠল ওখান থেকে। বিন্দে তখনও কথা কইলে না, ঘাড় তুললে না, তেমনি কাঠের মতই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল।

নরুর মা হরির লুট দিয়ে পাড়ায় সন্দেশ বিলোলেন। পাগড়ীর মা সত্যনারায়ণের যোগাড় করলেন। ইতিমধ্যেই স্থির হয়েছে যে নরু সায়ান্স নেবে; সেটা স্থির করেছেন অবশ্য নরুর বাবাই। ছেলে অঙ্কে কাঁচা তা তিনিও জানেন, কিন্তু এই পাশটা করার পর থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, ইচ্ছে করলে নরু সবই পারে। পাগড়ীর দাদা মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ, তিনি হাফ-ইয়ার্লি আর টেস্টের নম্বর মিলিয়ে ভাইকে আর্টস্ পড়তে দেবেন স্থির করেছেন।

বিন্দে তিন চার দিন বাড়ী থেকে বেরোয় নি, ওরাও বিশেষ আসেনি। সেদিন যে কারণে ওরা সারাদিন ওর ঘরে বন্ধ হয়ে বসে ছিল, এখন সেই কারণেই ওরা যাচ্ছে না। লজ্জাটা যেন ওদেরও কম নয়—কী বলবে বিন্দেকে, কী কথা কইবে এবং বিন্দেই বা সে সব কথা কীভাবে নেবে, এই ওদের দুশ্চিন্তা।

কিন্তু বিন্দে ঘরে বসেই খবর পায় সকলের। ছোড়দি পাড়া থেকে

সংগ্রহ করে আনেন এবং ওর কাছে বসে আপন মনেই শোনান! বিন্দে 'হাঁ, না' কিছুই করে না, কিন্তু সব কথাই মন দিয়ে শোনে। নিজের ছেঁড়া টেস্ট্ পেপার আর পুরোনো বইগুলো ধুলো ঝেড়ে আবার নিয়ে বসতে হয়! ওর যেন চোখ ফেটে জল আসে। আরও লজ্জা পাবার ভয়ে অতিকষ্টে দমন করে। বসে বসে বইয়ের পাতা আর পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করে, কান থাকে কিন্তু ছোড়দির দিকেই—

নরু ভর্তি হল বঙ্গবাসীতে, পাগড়ী আশুতোষে। আরও অনেকে ভর্তি হয়ে এল—একজন বিদ্যাসাগরে, দুজন আশুতোষে, একজন সেণ্ট জেভিয়াসে। নরু আবার ফোর্থ সাবজেক্ট নিয়েছে, ছোড়দি খবরটা শুনিয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। কী ভাবেন ওর বাবা ছেলেকে ?……

আরও খবর আসে, নতুন পোশাকের অর্ডার গেছে নরুর। পাগড়ীর দাদা তসরের জামা করিয়ে দিচ্ছেন। যে যা চাইছে, অভিভাবকদের কাছ থেকে তাই পাচ্ছে।

আর একদিন ছোড়দি এসে খবর দিলেন, 'দল বেঁধে সবাই সিনেমা দেখতে গেল রে বিন্দে—খালি নরু আর পাগড়ী বাদ। সত্যিই তোর জন্যে ওদের সব আমোদ মাটি!'

সে দিনের পর এই প্রথম বিন্দের মুখে হাসি ফুটল। খুব ম্লান, তবু হাসিই। মুখ তুলে ঈষৎ স্খলিতকণ্ঠে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'তা ওরা গেল না কেন ? এর কোন মানে হয় না!'

কিন্তু আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ওর বুক ভরে গেল। হ্যাঁ, এটা ওর প্রাপ্যই—এতদিনের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। বিন্দে নিজে হ'লেও এ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারত না। গর্ববোধও হ'ল ওর—সকলে দেখুক, কি-রকম বন্ধু সব তার।

কমা ও সেমিকোলন

'তা কখনও হয়! তাই পারে ওরা যেতে?' ছোড়দি বলেন।……

সেইদিনই নরু আর পাগড়ী এল বিকেলবেলা।

খানিকটা চুপ করে বসে রইল ওরা দুজনে। বিন্দে টেস্ট পেপারে অভিনিবিষ্ট।

মিনিট-কতক পরে নরু বললে, 'তুই কি অন্য কোন ইস্কুলে যাবি, না, এইখানেই থাকবি?

'অন্য ইস্কুলে গিয়ে কি হবে?…এখন ত বাড়িতেই পড়ব, শুধু একটা নাম থাকা।'

'তা বটে।'…আর যেন কোন কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাগ্যিস্ ছোড়দি এলেন। ছোড়দি এই কদিনের জন্যে বাপের বাড়ি না এলে কী যে হত তা ভাবাই যায় না।

ছোড়দি বসে বললেন, 'তোদের ফিফ্‌টিনথ্ আগস্টের কি হ'ল?'

'কী আবার হবে? বিন্দে ছোঁড়ার জন্যে সব মাটি হয়ে গেল!'

'তা তোরা যা না! ও না হয় না-ই গেল!'

'সে হয় না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে পাগড়ী।

খানিকটা পরে নরু বললে, 'আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না ছোড়দি, ও যদি যায় ত আমরা যেতে পারি। কী এমন হয়েছে যে ঘর থেকে বেরোচ্ছে না একেবারে?…আমরা ত সবাই সমান মেরিটের ছেলে—এটা ওর য়্যাকসিডেণ্ট একটা। এই ত ক্ষিতীশদা বলছিলেন, পাশ না করলে কী একেবারে জীবন বৃথা হয়ে যায়!'

ছোড়দিও সস্নেহ কণ্ঠে বলেন, 'তা যা না বিন্দু, একদিন একটু ঘুরে আয় না! ওরা বলছে অত করে, একজনের জন্যে সবাইকার আনন্দ মাটি হবে?'

কমা ও সেমিকোলন

'ওরা যাক্ না' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে বিলে বিন্দে, 'আমার ভাল লাগে না। এমনিই ত সাইকেল চড়া আমার ভাল লাগে না তেমন জানো!'

'জানিস্ ত তা হয় না, তবে ন্যাকামি করছিস কেন?' নরু একটু ধমক দিয়ে ওঠে।

'কী যে তোর হ'ল! আশ্চর্য!' পাগড়ী আপন মনেই বলে।

সেদিন থেকে বিন্দের দুঃখটা যেন সহনীয় বলে মনে হ'ল অনেকটা। সে পরের দিন পাড়ায় বেরোল একবার। সবাই খুব সাগ্রহে ও সাদরে ওকে অভ্যর্থনা করলে। চারিদিকে একটা হুল্লোড় পড়ে গেল যেন, 'ওরে বিন্দে এসেছে রে-এ-এ—!'

কিন্তু এদের দলে ফেল-করা একজনকেও খুঁজে পেলে না বিন্দে। একটু পরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে তারা তিন চারজন কানুদের রকে বসে গল্প করছে। ওকে দেখতে পেয়ে দিব্যেন ডাকলে হাতছানি দিয়ে। আশ্চর্য, বিন্দে অবাক হয়ে ভাবে, এরই মধ্যে কেমন করে দুটি দল হয়ে গেছে আপনা থেকেই। সার্থকদের দল আর হতভাগ্যের দল। ওরা হয়ত এখনও টেরই পায়নি যে এমন দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে ওরা।

এর পর নরু আর পাগড়ী দুজনেই আসে বিন্দের বাড়ি। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যই। ওরা যেন আর পরস্পরের সঙ্গে কইবার মত কথা খুঁজে পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার যে সব বিষয় ছিল, যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে সব। ফুটবল ক্লাব ও লাইব্রেরীর কথা তোলে—এই দুটিতে কত আগ্রহ ছিল বিন্দের, কত রকমের পরিকল্পনা ছিল ওর এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলবার—কিন্তু এখন আর কোন সাড়াই আসে না ওর কাছ থেকে। কেমন যেন হয়ে গেছে ও। কিছুতেই কোন উৎসাহ

নেই, হাঁ হুঁ করে জবাব দেয়, অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় তাড়াতাড়ি। ওদের আলাপ জমে না—একটু পরেই উঠে পড়ে।

বিন্দেও ওদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে। নরুর যেন এরই মধ্যে বড় চাল বেড়ে গেছে—কথা বলবার ভঙ্গীও গেছে পাল্‌টে। পাগড়ী ত কলেজের কথা, ওদের কোর্সের কথা ছাড়া কথাই বলে না—অবশ্য ওর কাছে নয়, বাইরে। তা হোক। এখনও ত কলেজ করেনি একদিনও, তাতেই এই? বিন্দে হাসে একটু। ছেলেমানুষি দেখলে প্রবীণেরা যেমন হাসেন—কতকটা সেই রকমই।

কী এমন করেছেন সব! আহা! কত বাহাদুরী! তবু যদি পাগড়ী অঙ্কের দিন হলে বসে না টুকত অপরের দেখে। অমন করে টুকলে বিন্দেও পাশ করতে পারত।······

তেরই আগস্ট সকালে চোখ খুলে জানলায় এসে দাঁড়াতেই বিন্দের নজরে পড়ল ওদের গলিটা যেখানে হঠাৎ পূব মুখে বেঁকে গিয়েছে—সেইখানে একটা জটলা। সরে পাশের জানলাতে এসে দাঁড়াতেই আরও ভাল করে দেখা গেল। নরু-পাগড়ী-কানু-পটলার দল। তিন চারখানা সাইকেল এসে জড়ো হয়েছে, নরু এসব ব্যাপারে ওস্তাদ, সে রাস্তার ওপরেই উবু হয়ে বসে একটা সাইকেলে প্রাণপণে পাম্প চালাচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে কান পেতে শুনছে, কোথাও লিক হচ্ছে কিনা।

অকস্মাৎ যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল বিন্দের। এ আয়োজন যে কিসের তা বুঝতে বিলম্ব হয় না ওর একটুও। পরশু ভোরের প্রোগ্রাম তাহলে বাহালই আছে! যে যার সাইকেল ঠিক করে রাখছে, অনেককেই

পরের সাইকেল চেয়ে নিতে হবে—সেগুলোর মেরামত দরকার। তাই নরুর শরণাপন্ন হয়েছে সবাই—

এ যে কী আঘাত তা বিন্দে বুঝতেও পারে না। বুকের মধ্যটা যেন কে দলে পিষে মুচড়ে দেয়। তা যাক্ না ওরা, স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। কীই-বা বলবার আছে বিন্দের? কিসের দাবীতেই বা আট্‌কাবে ওদের। আর কেনই-বা আটকাবে? ও ত নিজেই বলেছে ওদের যে, তোরা যা—তবে মিছি মিছি এ ন্যাকামি করার কি দরকার ছিল?

চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে ওর। সমস্তটা যেন ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টির সামনে। কোনমতে নিচে নেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেয়। তবু ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে উষ্ণ অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে আসে তা ও বেশ বুঝতে পারে।······

নিজের দুর্বলতায় নিজেই চটে যায় বিন্দে। জোর করে মনকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে বইয়ের দিকে। ছাদে গিয়ে প্রাণপণে অঙ্ক কষতে চেষ্টা করে।

বিকেলে নরু এসে আবার ধরলে ছোড়দিকে, 'বলুন না ছোড়দি ওকে যেতে—ও গেলেই দল কম্‌প্লিট হয়।'

'বৃথা বলা ভাই নরু, ও যদি তোদের কথা না শোনে ত আমার কথা শুনবে? দেখছিস না বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে না!·· তোরা বরং যা—'

খানিকটা মুখ গোঁজ করে বসে থাকবার পর নরু বলে, 'দ্যুস্! সব যেন কী তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এধারে এ-ছোঁড়া এমনি গোঁ ধরে বসে আছে, ওধারে পাড়ার ছেলেরাও জেদ্ ধরেছে আমাকে যেতে হবে। ···মানে—' একটু থেমে আবার বলে, 'মানে, ওরা ত সাইকেলের কিছু জানে না কিনা, তাই আমি সঙ্গে না থাকলে সাহস পায় না—'

কমা ও সেমিকোলন

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা তোরা যা না। যাবি না কেন? বাস্তবিকই এক-জনের জন্যে সকলেব ইয়েটা মাটি হয় কেন!'

বিন্দে দালানে দাঁড়িয়ে শুনছিল উৎকর্ণ হয়ে, আর দাঁড়াতে পারল না। ন্যাকামি করতে আসার দরকারটা কি, ঠিকই ত হয়ে গেছে, সব প্রস্তুত, মিছিমিছি—। সে আর দাঁড়ায় না, বাড়ীতেও থাকে না। একটু পবে খোঁজ করতে গিয়ে নরু শুনলে যে, সে কখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। নরু এসেছে শুনেও দেখা না করে চলে গেল? আশ্চর্য ত! মনে মনে একটু অভিমান নিয়েই ফিরে গেল নরু।

·

১৪ই রাত্রে ওরা সকলে কানুদের বাইবের ঘবে শুয়ে থাকবে, কারণ ভোরবেলাই নাকি যাত্রা। বাত চারটেয় আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে কে ঘুম ভাঙাবে? ছোড়দি এসে খবর দেন।

আরও খবর আসে একে একে। চারটে বড বড ফ্লাস্ক জোগাড় হয়েছে; কানুর বৌদি রাত চারটের সময়েই চা তৈবী কবে দেবেন। তিনটে টিফিন বাস্কেট যাচ্ছে, নরুদের বাড়ী থেকে খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে রাত্রেই। মুখ শুকিয়ে যাবে বলে নরুর বাবা তিনদিন আগেই ভাল বিলিতী লজেঞ্জস্ এনে রেখেছেন।

তা যাক্ না, ভালই ত। ওর কাছে গোপন করবার কি দরকার ছিল?

সে রাত্রে বহুক্ষণ বিন্দে বই খুলে বসে রইল, কিন্তু বইয়েব পৃষ্ঠাব একটি বর্ণও ওর দৃষ্টি ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌছল না। কী একটা দুর্বার অভিমান যেন ওর সমস্ত অন্তরকে উদ্বেল করে তুলেছে। কোন যুক্তিতে আসে না, কারণ মেলে না, তবু অভিমানের যেন শেষ নেই। কত কি

কমা ও সেমিকোলন

মনে পড়ছে আজ, অতীত জীবনের কত কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। অনাবিল আনন্দরসধারায় প্লুত ওদের সখ্যের নানা অভিব্যক্তি। চোখে জল আসে বার বার। নরুদের দিক থেকেও কিছু বলবার আছে, হয়ত বিন্দে অবিচারই করছে কিছু ওদের ওপর, কিন্তু সে কথা ওর কিছুতেই মনে পড়ল না, শুধু ওর বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল অন্তর্গূঢ় বেদনায়, অকারণ একটা নিরুদ্ধ অভিমানে—

সেদিন সারারাত ওর ঘুম হ'ল না। কানুদের বাড়ীটা গলির একেবারে শেষপ্রান্তে, তবে নিশীথরাত্রির নিঃশব্দ স্তব্ধতায় সামান্য আওয়াজও বহুদূর যায়, তাই উৎকর্ণ বিন্দের কানে সামান্য একটু উসখুস শব্দও এড়াল না। প্রথম কে এসে ডাকলেন ওদের। ওদের অতৃপ্ত নিদ্রা ও আলস্যের তন্দ্রাতুর একটা জড়তা। তারপর বাড়ীর লোকের ঘুম না ভাঙাবার প্রাণপণ প্রয়াসে চাপা ফিস্‌ফিসিনি। প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন। তারপর—এইবার বোধ হয় যাত্রা।

হ্যাঁ। ফিস্‌ফিসিনি আনন্দে ও উত্তেজনায় প্রবল গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে। বিন্দে আর স্থির থাকৃতে পারে না। মেজদার পাছে ঘুম ভাঙে, এই ভয়ে সে পা টিপে টিপে উঠে, সন্তর্পণে খিল খুলে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

ঐ ত। সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সাইকেল নিয়ে। এখন শুধু সামান্য সামান্য তথ্য নিয়ে মতভেদ। টিফিন বাস্কেটগুলো কার কার সাইকেলের পিছনে যাবে তাই নিয়ে বিতর্ক। ছ'খানা সাইকেল, আটজন আরোহী, দুজনকে পিছনে নিতে হবে। কে কাকে নেবে তাই সমস্যা।

কে যেন একবার মুখ তুলে তাকালে বিন্দেদের বাড়ীর দিকে। বোধ

হয় নরু। কিন্তু বিন্দে থামের আড়ালে মিশে দাঁড়িয়েছিল, অন্ধকারে তাকে দেখা গেল না নিশ্চয়ই।

পৌনে পাঁচটা নাগাদ ওরা যাত্রা করলে। তখন পূর্বদিক বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। ভাগ্যে আর কেউ ওপর দিকে চেয়ে দেখেনি, নইলে হয়ত দেখতে পেতো ওরা বিন্দেকে, সে বড় লজ্জার হ'ত, ছিঃ!······বিন্দের আশঙ্কা ছিল, নরু হয়ত আর একবার ওদের বাড়ীর দিকে তাকাবে। কিন্তু সে এতই ব্যস্ত যে—

তিনদিন বৃষ্টি হয়নি। ছ'খানা সাইকেলে এরই মধ্যে একটু ধূলোর ঘূর্ণাবর্ত দেখা দিয়েছিল রাস্তায়। সেই বড়-রাস্তার-মোড়ে-গিয়ে-মিলিয়ে-যাওয়া ধূলিরেখার দিকে চেয়ে বিন্দে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ, নিস্পন্দ হয়ে, যেন কিসের তপস্যায় সে ধ্যানমগ্ন।

একেবারে ওর চমক ভাঙল দিব্যেনের ডাকে। ওদেরও আজ সকাল করে ঘুম ভেঙেছে এদের কোলাহলে।

'কী রে?' ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে বিন্দে।

'নিচে একবার আয় না।' দিব্যেন বলে।

নিচে আসতে ওর দুটো কাঁধে দুটো হাত রেখে দিব্যেন বলে, 'বলছিলুম কি, একা-একা যেন আর কিছুতে মন বসছে না পড়ায়। আয় না, আজ দুপুরে দুজনে মিলে পড়ি। অঙ্ক কষা যাবে'খন, তাছাড়া অন্য পড়াও—'

কথা শেষ হবার আগেই বিন্দে প্রবলভাবে মাথা নাড়ে; 'না ভাই, কারুর সঙ্গে বসে পড়তে ভাল লাগে না। আর সে-পড়াও হয় না ঠিকমত, শুধু আড্ডা—'

সে দিব্যেনের হাত দুটো কোনমতে কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল—একরকম ছুটেই।

কমা ও সেমিকোলন

কে জানে কেন, আবারও ওর চোখ দুটো জ্বালা করে আসছিল। অকারণে—হ্যাঁ, একেবারেই অকারণে।

ও নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারে না দিব্যেনের এই সহজ ও সামান্য কথায় কেন এত চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে।

চোখে মুখে জল দিয়ে বই-খাতা নিয়ে বিন্দে ছাদে চলে যায়। দরজায় শেকল তুলে দিয়ে পড়তে বসে নিশ্চিন্ত হয়েই।

রাবণের চিতা

সবচেয়ে রাগ হয় ওর ভোরবেলাটার দিকে, যখন পরমহরি এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এবং সেই বুজে-থাকা চোখে উঠে এসে নিবস্ত উনুনে কয়লা ঢেলে নিচে থেকে ছাই বার করতে বসতে হয়। এক একদিন অসহ্য আক্রোশে ছাই-বার-করা শিক্‌টা দিয়ে উনুনটাকে খোঁচায় বসে বসে, 'শালা ভাঙেও না, নেভেও না—যেন রাবণের চিতা—জ্বলছে ত জ্বলছেই!······মর্ মর্—'

বাস্তবিক কার না রাগ হয়! তখনও ভাল করে সকাল হয় না—ঘোর-ঘোর অন্ধকার থাকে চারিদিকে। একে ঘুমন্ত চোখ তায় অন্ধকার, ভাল করে দেখাই যায় না। এই ত সবে শুয়েছে, রাত একটা দেড়টার কমে হয় না কোন দিনই—আবার এই ভোর চারটে না বাজতে বাজতেই ডাকাডাকি করবে। মানুষ না পিশাচ! ওর চোখে কি ঘুম নেই?·····শীতকালে তবু একটু সময় পাওয়া যায় ঘণ্টাখানেক বেশি, কিন্তু গরমের দিনে, ছোঃ!······ রাত চারটে বাজার আগেই দ্যাখো পূবদিক ফরসা হয়ে বসে আছে!

শহরতলীর চওড়া বড় রাস্তাটা বাস্-এর পথ থেকে বেরিয়ে এসে যেখানে একটু বেঁকে বাজারের দিকে চলে গেছে, ওধারের তিনটে পাড়ার প্রধান রাস্তাগুলো এসে মিলেছে সেইখানেই। এটাকেই এখানকার চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। বাজার, স্টেশন, পোস্ট-অফিস সব যেন জড়াজড়ি করে রয়েছে। ওদের খাবারের দোকানটা এই মোড়ের মাথাতেই। কাজেই—ভোর থেকে প্রথম লোক চলাচল শুরু হতেই এই দোকানে ভীড় লাগে

আর রাত বারোটা পর্যন্ত খদ্দেরের কামাই নেই। শুধু দুপুরের দিকে ঘণ্টাদুয়েক একটু কম থাকে, সেই সময়টাই ওদের স্নানাহার এবং মিনিট-কতক একটু চোখ বোজবার যা কিছু অবসর মেলে। কিন্তু তাতে কি হয়? এক একদিন মনে হয় কান্নুর যে, যদি সময় কখনও পায় ত. ও পুরো দুটি দিন দুটি রাত শুধু ঘুমিয়েই কাটাবে। উঠবে না, নাইবে না, খাবে না—কিচ্ছু না!

আর লোকগুলোও তেম্‌নি—রাক্ষস একেবারে। ভাল করে ফরসা হবার আগে থাকতেই এসে জমতে শুরু করবে, 'ও কালো দা, জিলিপি হয়েছে? কচুরী ভাজা হ'ল? কালো—সিঙ্গাড়া?'

কালো অর্থাৎ পরমহরির ছোট ভাই—সেই মিলিত আক্রমণে বিব্রত হয়ে সব ঝালটা ফেল্‌বে ওদের ঘাড়ে, 'হবে কি, হবার কি কিছু যো আছে! যত সব জুটেছে আমাদের এখানে নবাবপুত্তুরের দল, বেলা আটটার আগে কারুর ঘুম ভাঙে না! এ সব লোক নিয়ে কি দোকান চলে, না লক্ষ্মী থাকে! দেখগে যাও অন্য দোকানে—এতক্ষণে অমন বিশ পঁচিশ সের জিলিপি ভাজা শেষ হয়ে গেল! আর আমাদের? ছোঃ! এত যদি আয়েস ত ময়রার দোকানে কাজ করতে আসবার দরকার কি?'

ওরা অর্থাৎ কারিগরের দল রাগে গজরায়। উত্তর দেয় মধ্যে মধ্যে মেধো বা মাধব। সে অত কারুর তোয়াক্কা রাখে না—সে জানে সে কাজের লোক। খুব খারাপ ছানাতেও সরেশ রসগোল্লা করতে এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই; সে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে সেইখানেই তার কাজ মিলবে। সে-ই শুধু মধ্যে মধ্যে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেয়, 'থামো দিকি বাপু, তুমি আর ব'কোনি! ওধারে পাট চুকতে রাত একটা-দেড়টা বাজবে আবার এধারে রাত চারটে না বাজতে বাজতে ডাকাডাকি করবে! মানুষের

শরীর ত। আর কত ভোরে উঠতে হবে তাই শুনি! এই ত তিন খোলা জিলিপি নেবে গেল, এখনও স্থয্যি ওঠেনি—কাগে এখনও গু খায়নি! আবার কি রাত থাকৃতে তৈরী করতে হবে নাকি? তা রাত্তির বেলা করে রাখলেই পারো—।'

এরপর আর কালোর কণ্ঠস্বরে খুব জোর থাকে না, কতকটা বিড় বিড় করেই বলে, 'হ্যাঁ, রাত একটায় ত আমরাও শুয়েছি—আমাদের কি করে ঘুম ভাঙে? কৈ, আমাদের ত আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না!'

'তা করবে কেন?' মেধোও সমান তেজে জবাব দেয়, 'তোমাদের যে কারবার। তোমাদের সারারাত খুলে বসে থাকলেই ভাল হয়—যতক্ষণ খোলা থাকবে, ততক্ষণই পয়সা! পয়সার গরমে তোমাদের শরীর আপনিই ভাল থাকে, তোমাদের ঘুমোবার দরকার কি? ওর তুল্য নেশা আছে? বলে, মানুষের খাওয়ার কথাই মনে থাকে না ত ঘুম!······আমাদের ত আর তা নয়—হাড়মাস মাটি করে তবে পয়সা, আমাদের শরীরটার দিকেও চাইতে হয়। যতক্ষণ খাটতে পারব, ততক্ষণ যেখানে যাবো সেখানেই কদর—নইলে? বসে বসে কেউ খেতে দেবে?'

বাস্তবিক, কানু ভাবে আরও কি চায় এরা? এই গরম, তায় পুবমুখো দোকান। গন্ গন্ করছে সামনে আগুন, কড়ায় ফুটছে এককড়া ভেজিটেবল্ ঘি—আর মুখে এসে পড়েছে কড়া রোদ—এইখানে বসে ত কাজ করতে হয়। সামনের দিকে একটু ছেঁড়া কাপড় টাঙানো হয় বটে, তাতে রোদ্দুরের ঝাঁজ আট্‌কায় না। আর উনুন কি একটা? পেছনে একটা—সেটাতে সকালবেলা জিলিপি অমৃতি ভাজা হয়, অন্য সময় হাল্‌কা কাজ চলে—গুঁজিয়া, পেঁড়া ইত্যাদি। নিজেদের ভাত-ডালও রান্না হয় ঐ উনুনেই। এটা তবু ছোট, ভিতরে আর একটা আছে ঠিক বাইরের

কমা ও সেমিকোলন

ঐ রাবণের চুলির মতই ডাগর, কি হয়ত আরও বেশি। সেটাতে রসগোল্লা. ক্ষীরমোহন, পান্তুয়া, ছানার গজা—মানে যত সব ছানার কাজ চলে। মেধো থাকে সেইখানেই, সে আর তার দু'জন চেলা—মেধো বলে, 'য়্যাসিসট্যাণ্ট' ; আর বাইরের এই রাবণের চুলি, এখানে শুধু ময়দার কাজ। সকালের ফাঁপা কচুরী, নিম্‌কী, সিঙ্গাড়া—একটু বেলায় ঢাকাই পরোটা, তারপর দুপুরে বিশ্রামের পরই আবার শুরু হয় সিঙ্গাড়া, নিম্‌কী, খাস্তার কচুরী, হিঙ্গের কচুরী, রাধাবল্লভী—যতক্ষণ না সন্ধ্যে বেলার রাক্কসদের ক্ষিদে মিটছে! সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে, কিংবা এক একদিন রাত গভীর হ'লে তবে এ পাট শেষ হয়, তখন শুরু হয় খাস্তা গজা, বালুশাহী, লবঙ্গ-লতিকা, ক্ষীরের চপ—যত রাজ্যের ময়দার কাজ। মিহিদানা, দরবেশ এ সবগুলো ভেতরের উনুনেই হয়—ছানার কাজের ফাঁকে ফাঁকে!

এত রকমও খাবার আছে পৃথিবীতে! কানু মাঝে মাঝে আপন মনেই গাল পাড়ে, 'মুখপোড়া মানুষের আর আশ মেটে না—এত নোলা!...... মিষ্টি তাই কি ছত্তিশ রকমের? কেন রে বাপু, এক রকম দুরকমে কি মন ওঠে না? ঐ ত সাহেবদের খালি কেক্ আর কেক! তাদের কি দিন কাটে না?'

হয়ত কথাগুলো পরমহরির কানে গেল, সে সকালের বিক্রীর খুচরো পয়সাগুলো গুন্‌তে গুন্‌তে চোখ না তুলেই বল্‌লে (এই সব পয়সা রাত্রে হিন্দুস্থানী আলুওয়ালা নিয়ে যাবে—সামান্য বাটা দিয়ে—এতেও লাভ!) 'কে বলেছে রে ছোঁড়া তোকে? সায়েবদের খাওয়ার তুই কি জানিস?... কেক্ আছে, প্যাস্টি আছে, পুটিং আছে—তাও কি এক রকমের? হরেক রকমের! ওরে বাপু, মানুষ সব সমান, এক একটি ক্ষুদ্দুর রাক্কস সব! তবে হ্যাঁ—যার যা পছন্দ! তোমরা গাজা গজা পান্তোয়া পছন্দ করো—

ওরা খায় প্যাস্টি পুটিং—এই যা তফাৎ……আর তাই যদি না খাবে ত তোরা করতিস্ কি? কী চাক্‌রী করতিস্ তাই শুনি? সায়েবদের আপিসে কলম পিসতিস্ না কি? য়্যঁা!……হে-হে!'

পানখাওয়া কালো দাঁত বার ক'রে হাসত পরমহরি, পরকে আঘাত করার অপূর্ব এক পরিতৃপ্তি ফুটে উঠত ওর মুখে সে সময়।

বাস্তবিক, আর কীই বা করতে পারত কানু!

কথাটা পরমহরি মিথ্যে বলেনি।…আর কী চাকরীই বা করত সে!

জাত ময়রার ছেলে নয় কানু। এ ওর পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি নয়। গয়লার ছেলে, ওর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই আজ কলকাতায় সাহেবের অফিসে চাকরী করে, কেউ কেউ মোটা মাইনের সরকারী চাকরীও করছে। ওর নিজের মামাতো ভাইয়ের শ্বশুর নামকরা প্রফেসর, বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ী তার, একখানা গাড়ীও আছে। লেখা-পড়া শিখলে কানুও চাই কি আজ গাড়ী চালাতে পারত। অন্তত একটা ভাল চাকরী করে কলকাতায় থেকে পাখার নিচে ইজিচেয়ারে শুয়ে কাটাতে পারত—চাই কি ঐ মানিকবাবুর মত ইজিচেয়ারের পাটায় পা তুলে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চায়ের সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে ওরই মত কোন কারিগরের তৈরি জিলিপি কচুরী খেত সে!

কিন্তু তা হয় নি—হবার নয় বলে। ওর বাবাও চাকরী করতেন, তবে সে দেশেই—এক গোলদারী দোকানে খাতা লিখতেন, তার সঙ্গে ছিল সামান্য বিঘে দুই জমি, তাতে একরকম ক'রে চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা গেলেন—মোটে তিন দিনের জ্বরে—ডাক্তার পর্যন্ত ডাকার অবসর হ'ল না। তিন দিনের জ্বরে কেউ দেশে-ঘাটে ডাক্তার ডাকে না, বড় লোকেরাও না। তারপর একেবারে অন্ধকার।……ওর তখন মোটে

কমা ও সেমিকোলন

পাঁচ ছ' বছর বয়স, ওর দিদির আট। সুতরাং মাকেই কাজ করতে বেরোতে হয়েছিল। বাসন-মাজা কাজ, যা ওদের জাতে কেউ কখনও করে না, করবার কথাও নয়। শুধু বাধ্য হয়েই—ওদের মুখ চেয়ে তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিল—

কিন্তু সে মাও ওদের অদৃষ্টে বেশিদিন বাঁচলেন না। বছর তিনেকের মধ্যেই মারা গেলেন—কলেরায়। আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁরা কলকাতায় থাকেন, দেশে যাঁরা থাকেন তাঁদের কারুরই পরের ঝামেলা নেবার অবস্থা নয়। তবু তাঁরাই উপায় একটা করলেন—সজাতি একটি ভাল ছেলে দেখে তাঁরা দিদির বিয়ে দিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে দু বিঘে জমি তাকেই ধরে দিলেন। নইলে সে ছেলে বিয়ে করবে কেন? ওদের ভিটেটুকু শুধু রইল কানুর জন্য। মুরুব্বিরা বল্লেন, ও বেটাছেলে, যদি কোনদিন মানুষ হতে পারে ত ঐখানেই আবার ঘর তুলে নেবে—কোথায় থাকবে, কি করবে তারই যখন ঠিক নেই, তখন তার ভরসায় এ জমি রেখে কি হবে, বরং মেয়েটাকে পার করা দরকার।'

এরপর দিদির কাছেই ছিল সে বছর-দুই আরও। দিদির শ্বশুর লোক মন্দ নয়—দুটি ভাত খেতে দিতে নারাজ ছিল না কোনদিনই, কিন্তু লেখা-পড়া শেখানোর জন্য বেশি পয়সা খরচ করা তার সাধ্যেরই অতীত। তা ছাড়া, কানুর আজ আফসোস হয়—তারও তখন লেখাপড়ায় মন যায়নি। তাহ'লে হয়ত দিদি যেমন করে হোক্ শেখাতো ওকে, পাড়ার পিও পণ্ডিত (প্রিয়নাথ পণ্ডিত) ত বিনি পয়সাতেই তাঁর পাঠশালায় রেখেছিলেন।

না, লেখাপড়ায় ওর মন ছিল না একেবারেই। সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পর ওর দিদির শ্বশুর ওকে দিলে পাড়ার ময়রার দোকানে—ওর

ভাষায় 'য়্যাপেণ্টিশ্' করে—এক বছর সেখানে পেটভাতায় চাকরী করার পর ওর প্রথম মাইনে হয়েছিল দু টাকা। আরও মাস ছয়েক পরে পাড়ার মণিদা ওকে এখানে নিয়ে আসে, সে নিজেও এখানে কাজ করত, একেবারে ছটাকা মাইনেয়। সেই থেকে আজও সে এখানে আছে। মণিদা অবশ্য আর নেই, কল্‌কাতার এক বড় দোকানে কাজ করছে সে, মোটা মাইনের কাজ।

মাইনে অবশ্য আজ কানুও মন্দ পায় না। যুদ্ধের দৌলতে সবাই টাকার মুখ দেখেছে—এই দোকানই নাকি একবার অচল হয়ে যায়, সেই সময় পরমহরি কিনেছিল মোটে আড়াই শ' টাকায়, সাজ-পাট সুদ্ধ! আজ একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, পরমহরিকে এখন টাকার আণ্ডিল বলা চলে। ওর মাথায় পাখা ঘুরছে, কালো বসে বেচে নিজে, তার পেচনে একটা টেবিল ফ্যান—সম্প্রতি ফ্রিজিডেয়ারও বসেছে। আগে এই বাইরেই যা একটা উনুন ছিল, এখন ভেতরে আরও দুটো জ্বলে সারাদিন-রাত, আর একটা আছে বাড়তি—পূজো ভাইফোঁটা এইসব উপলক্ষ্যে জ্বলে। সম্প্রতি কথা চলছে জন-দুই কারিগর বাড়িয়ে ওটাও দিনরাত জ্বালানোর। পরমহরিদের দেশে মাটির ঘর ভেঙে পাকা দোতালা উঠেছে, এখানেও নাকি একটা বাড়ী কিনেছে পরমহরি, বৌয়ের নামে। তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে মনোমালিন্য চলছে একটু একটু—বড় চেষ্টা করছে কালোকে সরিয়ে দেবার। আসলে নাকি পরমহরিরই সব, টাকা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম—শুধু ভাই বলে সে কালোকে ভাগ দিতে নারাজ। যাই হোক্—কানু যে আজকাল আঠারো টাকা পাচ্ছে এটা কম কথা নয়। মালিকদের ঘর বাড়ী হ'ল কি না সেটা তার দেখবার দরকার নেই।

কমা ও সেমিকোলন

আঠারো টাকা আর খাওয়া। আর পুজোয় একজোড়া কাপড় কিংবা কাপড় আর জামা। তা খাওয়ায় মন্দ নয়। মাছ দুবেলাই দেয়, মাছ আর দাল, আর যা হোক্ একটা তরকারী—মেধো বলে ঘ্যাঁট্! এছাড়া মধ্যে মধ্যে আবদার ধরলে মাংসও জোটে। তবে সে আবদার ওরা বড় একটা ধরে না। কলকাতার বড় দোকানে নাকি এই সব কর্মচারীদের বামুনঠাকুর থাকে আলাদা—কিন্তু এখানে ওদেরই নিজেদের রান্না করে নিতে হয়। পালা ক'রে দুজন দুজন ক'রে রাঁধে, এই উদয়াস্ত খাটুনির পর আবার কুট্‌নো কুটে বাটনা বেটে রাঁধতে বসা—বিশ্রী লাগে। তবে দইটা, রাবড়ির ঝোলটা এ ওদের জোটে অনায়াসেই; দুবেলা জলখাবারের সময় রাজভোগ বাদ যে-কোনও মিষ্টি আর লুচি। কচুরী সিঙ্গাড়াও খেতে পারে ইচ্ছে করলে তবে সে ওদের আর ভাল লাগে না।

অর্থাৎ, একরকম সুখেই আছে বলতে গেলে।

কিন্তু কানুর আর এসব ভাল লাগছে না। দিদি চিঠি লিখেছে গত মাসে, 'কিছু টাকা ত জমিয়েছিস, তাই দিয়ে এবার একটু একটু ক'রে ঘরদোর তোল্। বিয়ে ত করতে হবে—মেয়েও দেখছি আমি চারদিকে। একটু সেয়ানা মেয়ে দরকার। বৌ এখন দু-চার বছর আমার কাছেই থাকতে পারে—মাসে মাসে কিছু টাকা না হয় পাঠাস, কিন্তু নিজের একটা ঘরদোরও তুলে নেওয়া দরকার।'

এই চিঠিটাই একটু ভাবিয়ে দিয়েছে কানুকে। এতদিন শুধু ঘুমের অভাব আর দৈহিক কষ্ট ছাড়া কোন কথাই সে ভাবেনি। ভালই আছে ভাবত। এর মধ্যে যে আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে ওর, এবার যে ওকে বিয়ের কথা, ঘরকন্নার কথা ভাবতে হবে সে কথা ওর যেন মনে

ছিল না একেবারে। এমন কি, বছর খানেক আগে যেদিন দাড়ি কামাতে শুরু করে, সেদিনও না। যৌবন কবে এসেছে তাও জানতে পারেনি। ফিরে তাকায় নি কোনদিন নিজের দিকে। ভোর চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ওর কেটেছে নীরন্ধ্র পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। চটের পর্দা আর ভেজিটেবল ঘিয়ের ধোঁয়া ভেদ করে বাইরের জগৎ তার স্ত্রীপুত্র-পরিবার-জড়ানো পারিবারিক জীবন নিয়ে ভেতরে আসতে পারে নি।

দিদির চিঠিটা পাবার পর পরমহরির বিছানার পাশে টাঙানো বড় আয়নাটায় একবার নিজেকে দেখেছিল কানু। চেহারা ভালই ওর, পরিশ্রমে কৃশ হয়নি—বরং যৌবনের ছোঁওয়ায় কেমন যেন পুরস্ত নিটোল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলশ্যাম আর শ্যামবর্ণের মাঝামাঝি গায়ের রং, একটু গোঁফের রেখা দিয়েছে—তাতে মুখখানা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। না, চেহারা ওর ভালই—বর সাজবার মত চেহারা বটে। এই একটা খাবারের দোকানে সুবিধা আছে, এখানে কেউ রোগা প্যাংলা থাকে না। সবাই দিব্যি নাদুস-নুদুস, এমন কি অধিকাংশেরই একটু করে নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়ে গেছে। ওর পরে যারা এসেছে, একেবারে যারা ছেলেমানুষ, তাদেরও—

চেহারাও খারাপ হয় না, কারুর ঘামাচিও হয় না। তেল্ চক্‌চক্ করে, সুন্দর চামড়া—এত যে ঘামে ওরা দিনরাত, যেন মনে হয় চান ক'রে উঠল, কিন্তু তাতেও ত ঘামাচি কি ফোড়া হয় না। শীতকালেও কাজ যখন উনুনের ধারে বসে, সর্বাঙ্গ দিয়ে জলের ধারা গড়াতে থাকে, গরম কালে ত কথাই নেই। তবু কি সুন্দর গায়ের চামড়া ওর। পরমহরি বলে 'ঘিয়ের ধোঁয়া রে বাপু, ঘিয়ের ধোঁয়া—কম ঘিটা তোদের গায়ে যাচ্ছে আমার, আর ঐ ধোঁয়া খেয়ে খেয়েই ত ফুলছিস্ তোরা!'

কমা ও সেমিকোলন

'ঘি না ছাই!' মেধো আড়ালে ভেংচি কাটে, 'ঘি কাকে বলে তা ত ভুলেই গেছে লোকে। এই নাকি আবার ঘিয়ে ভাজা খাবার!'……

আয়নার সামনে সেদিন বেশিক্ষণ আর দাঁড়ানো হয়নি। পরমহরি খিঁচিয়ে উঠেছিল, 'চল্ চল্, আর আয়নায় মুখ দেখতে হবে নি। যা সোন্দর মুখ! ওধারে ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে। ছানার গজাটা করে নে আগে—যা!'

ছানার গজা, দানাদার, তারপরই রসগোল্লা রাজভোগ, ছানার জিলিপি কালোজাম সারতে সারতে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল, ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল—আর কোন কথা মনে থাকেনি। সেদিনও না, পরের দিনও না। শুধু কাজকর্মের ফাঁকে পরমহরির বিছানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে, চকিতে, কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই, হয়ত এক আধবার চোখ পড়েছে আয়নার দিকে—বলিষ্ঠ, পূরন্ত চেহারা ওর, সুশ্রী একটা মুখ চোখে পড়েছে—ঘর্মাক্ত তেল চক্চকে চেহারাটা আয়নায় পড়েও চক্চক্ করে উঠেছে; ওর মনে পড়ে গেছে কথাটা। কিন্তু ভাল করে ভাববার সময় পেয়েছে কৈ?……তখনই কচুরি-সিঙ্গাড়া, মিহিদানার তাড়া এসেছে, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার জোগান দিতে যেতে হয়েছে, নিজের কথা ভাববার অবসর মেলেনি।

আজ আবার দিদি চিঠি লিখেছে। ভাল মেয়ে একটি আছে। তেরো বছরের ডাগর মেয়ে। তার বাবা বিঘে-দুই জমিও দিতে রাজী আছেন, তবে আর কিছু দেবেন না। বিয়ের খরচা যা কিছু ওকেই করতে হবে। কানু কি রাজী আছে তাতে? শ তিনেক টাকা পড়বে সবসুদ্ধ।… …বাড়া না হয় এখন থাক্, বৌ ত একা একটা বাড়ীতে থাকতে পারবে না। এখন বছর কতক বৌ ওর বাড়ীতেই থাকবে

—ততদিন আর কানু ঘর একখানা তুলে নিতে পারবে না? ত বিঘে জমিরও ত একটা আয় হবে, সে না হয় ওর ভগ্নীপতিই দেখাশুনা করবে, যতদিন না কানু দেশে গিয়ে বসে—। মেয়েটা বড ভাল ছিল কিন্তু। ফরসা রং, টানা চোখ—লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত দেখতে।

তিন শ' টাকা!

তিন শ' কেন, আর কিছু বেশিই বরং ওর জমেছে। নিজের নামে পোস্ট-অফিসে জমা রেখেছে। অনেকে পরমহরির কাছেই জমা রাখে, বছরে একবার করে যখন ছুটি মেলে পনেরো দিনের জন্য সেই সময় চেয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু কানু অত বোকা নয়। কানু দেখেছে সে সব ক্ষেত্রে ইচ্ছে করলেই চাকরী ছেড়ে যাওয়া যায় না, পরমহরি হাতে পেয়ে বেগ দেয়। তা ছাড়া হিসেবটাও একটু গুলিয়ে দেয় ইচ্ছে করেই, তাতেও যদি দু' চার টাকা আসে। তার চেয়ে সরকারী পোস্টাপিসই ভাল—দু-চার পয়সা সুদও পাওয়া যায়!……সুতরাং তিন শ' টাকা ইচ্ছে করলে সে বার করতে পারে। সত্যিই কিছু এখনই ওর ঘর তোলার দরকার হচ্ছে না। লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত সুন্দর মুখ, ফরসা রং, টানাটানা চোখ—একটা ছবি মনে মনে আনবার চেষ্টা করে ও। মন্দ কি? তেরো বছরের সুশ্রী একটি ভীরু মেয়ে, ও হবে তার স্বামী। ওর সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করে রাখবে সে প্রাণপণে, ওর পথ চেয়ে থাকবে। হয়ত—দু-চার লাইন লিখতেও শিখেছে, তা হলে এক-আধখানা চিঠিও লিখবে।

'কী হ'ল রে তোর কানু? ঘিয়ে সিঙ্গাড়া দিয়ে কি ভাবছিস্ আপন মনে? ওগুলো পুড়ে উঠছে যে! আর এদিকে এই খদ্দেরের ভীড়!'

ধমক্ দিয়ে ওঠে ফণী। কানু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সিঙ্গাড়াগুলো

তুলতে থাকে। ইস্, বড্ড কড়া হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি। দু-একখানা পুড়ে উঠেছে একেবারে। অনেক আগে তোলা উচিত ছিল।

শশাঙ্ক ঠাট্টা ক'রে বলে, 'ওর ব্রঁহ্ হয়েছে, ব্রঁহ্ (বিরহ)!'

ওদিকে কালোর দোকানের সামনে এক গাদা লোক জমে গিয়েছে, ছেলে বুড়ো অসংখ্য। সবারই চোখে একটা উগ্র লোলুপতা—মানুষ খাবারের জন্য এমন করে! ছি! কানুর ঘেন্না করে এদের দিকে চাইলে। পেট ছাড়া যেন মানুষের কিছু নেই। পেট কি দিনরাত জ্বলছে রে বাপু! রাবণের চিতা না কি? ওর এই উনুনের চেয়েও ওদের আগুনে বেশি তেজ।

পূর্ণ ওর ইশারা মত গিয়ে উনুনের মুখে লোহার চাকৃতিটা চাপা দিয়ে দিয়েছে। ঘি জ্বলে যাচ্ছিল বড্ড।

'নে নে হাত চালিয়ে নে। আজ কি হ'ল তোর?' ওদিক থেকে কালো খিঁচিয়ে ওঠে।

এই ত জীবন! অবসর নেই একদণ্ড। ভাববার পর্যন্ত সময় নেই। বিয়ে করেই বা ওর লাভ কি? বৌ থাকবে কোথায় আর ও থাকবে কোথায়? বছরে পনেরো দিন ছুটি। বড়জোর মধ্যে মধ্যে বলে ক'য়ে দু' একদিন। কিন্তু তাতে তার দিন কাটবে কি করে?

আর এই আঠারো টাকা মাইনে! চাকরী ছাড়লেও চলবে না—রেখেই বা চালাবে কি করে? দু' বিঘে ত জমি মোটে পাবার কথা—তখন দিদির বাড়ী থাকলেও ওকে টাকা পাঠাতে হবে নিয়মিত। বাজারের কী হালচাল তা ত ও নিজেই দেখছে। এখানে তবু রেশনের চাল—দেশে চালই যাচ্ছে সাতাশ আটাশ টাকা। বাজারে সে নিজেই যায় এখানে মধ্যে মধ্যে—দশ টাকার একটি নোট নিয়ে যায়, সব কাঁচাবাজারে রেখে

আসতে হয়। পটোল চৌদ্দ আনা, আলু এক টাকা, মাছ সাড়ে-তিন টাকা চার টাকা। যুদ্ধের মধ্যে বরং এত দর ওঠে নি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এর চেয়ে ঢের সস্তা ছিল—এ যেন কী হয়েছে!

আবারও চমক ভাঙে ওর। ফণী চেঁচাচ্ছে—'কি হয়েছে তোর আজ? নিমকীগুলোর দফাও সারলি?'

'বড্ড মাথাটা ঘুরছে ভাই! আর যেন পারছি না। তুমি একটু বসবে ফণী দা—?'

'সর্ সর্—বলিস্ নি কেন এতক্ষণ!' সস্নেহ কণ্ঠে ব'লে ওঠে ফণী 'তাহলে এগুলো গড়ে দে ততক্ষণ!'

বাঁচা গেল! তবু হাত দুয়েক দূরে ত বসতে পারবে—রাবণের চুলি থেকে। উনুন ত নয়, দিনরাত যেন ওদেরই পোড়াচ্ছে একটু একটু করে। রাবণের চিতা নাম রাখা ওর সার্থক হয়েছে।

কিন্তু এসব ভেবেই বা লাভ আছে কি? এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় ওর। আঠারো টাকা মোটে মাইনে। একটা প্রাণীর এক বেলা খেতেও কুলোয় না। তা ছাড়া ওর নিজের কাপড় জামা জুতো সব আছে।

এখানে মেধোই সব চেয়ে বেশি মাইনে পায়, ষাট টাকা। কিন্তু তার মত কারিগর কে আছে? এদের প্রত্যেকেরই দেশে জমিজমা বাড়ীঘর আছে—এটা উপরস্তু। যা পায় বছরে জমিয়ে নিয়ে একবার করে বাড়ী যায়। ওর মত অসহায় কে আছে?

ওর একটা অহেতুক রাগ হয় পরমহরির ওপর। নিজে বাড়ির পর বাড়ি করছে, লোহার সিন্দুকটা টাকায় ভরে উঠেছে—এত লোলুপতা কেন? পারে না মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিতে? আঠারো কুড়ি ছাব্বিশ—এই সব

মাইনে। আবার নিচের দিকে দশ টাকাও আছে। পূর্ণরা—ছোকরার দল—দশ টাকা হিসেবেই পাচ্ছে। অথচ দু' মাইল দূরে যাও মথুরা ঘোষের দোকানে—সেখানে কুড়ি টাকার কম মাইনেই নেই। ঐ ত মণিদা, কী এমন কারিগর? সেও সত্তর টাকা পাচ্ছে! আর এখানে? ছোঃ!

সেদিন সারা দিনটা কী যেন দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটল কান্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জীবন সম্বন্ধে ওর এই আঠারো বছরের অভিজ্ঞতার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবটা বাজিয়ে দেখলে সে। লোভনীয় প্রস্তাব খুবই তাতে সন্দেহ নেই—প্রথম যৌবনের উদগ্র লালসা ওর দেহের কোণে যেন সুপ্ত ছিল এতদিন, আজ সে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠতে চায়, সে কামনার লোভে ওর মাতাল মন টলতে থাকে। মন্দ কি? ঝাঁপ দিয়ে পড়বে? তারপর সে যা হয় হবে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি!

কিন্তু সাহস হয় না শেষ পর্যন্ত। বয়স কম হ'লেও দুঃখ ও দুর্ভাগ্য ওকে অনেক শিখিয়েছে ইতিমধ্যে। কেউ কারও না। কেউ বসিয়ে খেতে দেবে না কাউকে। খেটে খেতে হবে। খেটেও খেতে পাবে না হয়ত!

এক কাজ করলে হয় বটে—দেশে গিয়ে একটা ছোটখাট ময়রার দোকান দিলে হয়। কিন্তু সে কি চলবে? ভোঁদা গয়লার একখানা দোকান, তাই ভাল চলে বলে মনে হয় না। আবার একটা? যদি না চলে? তা ছাড়া, মূলধন কোথায়? যে পৌনে চার শ' টাকা জমেছে তাতে কোন মতে সাজ-পাট কিনে বসা যায়—কিন্তু একেবারে একা ত পেরে উঠবে না—একটা ছোকরা অন্তত রাখতে হবে। দুটো পেট, আবার

তার মাইনে, যদি না ওঠে? কিছুদিনের সঙ্গতি না রেখে নামা উচিত নয়!

তাছাড়া সে পৌনে চার শ' টাকা যদি কারবারেই ঢালে ত বিয়েটা করবে কি দিয়ে? সে ত একই কথা হ'ল!'

আর এই কাজ আজীবন করে যাওয়া? সারাজীবন এই রাবণের চিতার সঙ্গে যোঝা? একটু একটু করে নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা?

মন সায় দেয় না কিছুতেই। বরং আরও কিছু টাকা জমলে অন্য কোন কারবার, ছোট-খাট দেখে একটা মুদির দোকান কিম্বা কড়া-খুন্তি সাঁড়াশী—তার সঙ্গে হাঁড়ি-কুড়ি মনোহারীর একটা মিলানো দোকান দেওয়া যেতে পারে। সে দোকান যদি চলে, নিজের পরিশ্রমে আর ঐকান্তিকতায় চালাতে পারবে নিশ্চয়ই, তাহলে বিয়ে করবার ঢের অবসর মিলবে। কী আর এমন বয়স ওর, আরও দশ বছর অনায়াসে অপেক্ষা করা চলবে।

কিন্তু এই ত্রয়োদশী, ফরসা রং, টানা চোখের অপূর্ব প্রতিমা, লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত এই মেয়েটি থাকবে কি ততদিন? না, সম্ভব নয়। ওদের দেশে এখনও তেরো চোদ্দ বছরের বেশি বয়সের মেয়ে আইবুড়ো থাকা নিন্দের, বিশেষত ওদের জাতে।......

সারাদিন কাটে ওর একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে, একটা দুশ্চিন্তায়।

অবশেষে সন্ধ্যার সময় একরকম মরিয়া হয়ে গিয়েই কান্তু দাঁড়ায় পরম-হরির গদির কাছে।

'কী হে, কী চাই আবার তোমার?' পরমহরি খুচরো পয়সা গুনতে গুনতে প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে, আজ্ঞে, বলছিলুম যে—'

কমা ও সেমিকোলন

'বল বল—বলে ফেল যা আছে মনের মধ্যে। ভয়টা কি? লিভ্-ভরসায় বলে ফেল—'

'আমার কিছু মাইনে না বাড়ালে আর চলছে না।'

'কার চলছে না—তোমার না আমার?' ওষ্ঠের কোণে বাঁকা হাসি পরমহরির।

কানুর ইচ্ছে করে ওর মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে রক্ত বার করে দেয়, এই হাসি ঘুরিয়ে দেয় ওর।

'আজ্ঞে, আমারই চলছে না। আপনার আর চলবে না কী জন্যে!'

'এই, এই বাবা, আমিও ত তাই বলি। আমার চলবে নি কেন? তা তোমার যখন চলছে না, তখন তুমি সরে পড়ো। যেখানে গেলে চলবে, যে কাজ করলে চলবে—জজ ম্যাজেস্টার যে চাকরী হয় করোগে। খসে পড়ো আর কি!'

অমায়িক কণ্ঠস্বর ওর। নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু তার মধ্যে থেকেই নিষ্ঠুর একটা আনন্দ যেন ফুটে উঠতে চেষ্টা করে।

'আজ্ঞে—আপনারও অচল হ'ত, যদি এই সব কারিগর নিজের গণ্ডা বুঝতে চেষ্টা করত। আমরা খসে পড়লে আপনি চালাবেন কি করে?' রাগে ফেটে পড়ে কানু, বহু দিনের সঞ্চিত রাগ।

'সে আমি বুঝব বাবা। সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।...... না হয় দোকান বন্ধ দেব চার মাস। তাতে আমার সংসার অচল হবে না। কিন্তু তোমাদের চলবে কিসে সেটা ভেবেছ কি? সর্দার!'

'আমাদের ঢের দোর আছে। খাবারের দোকান কি একটা?'

'একটা কেন হবে বাবা। ঢের, ঢের আছে। তা আমি বলি কি বাবা, এক কাজ করো না কেন? একদিন ছুটি নিয়ে কলকাতা শহরটা

ঘুরে এসো গা—ছাখোই না কেউ বেশি মাইনেতে রাখে কি না। পাও চলে যাও, না পাও এখানেই কাজ করো। বেশি মাইনে চেয়েছ কিংবা চোখ রাঙিয়েছ বলে আমার কোন রাগ নেই। বিষদাঁত যেকালে রাখিনি কারোর, কুলোপানা চক্কর একটু তোল না, তাতে আমার কোন আপিত্যি নেই। ছাখো, বেয়ে চেয়ে দেখে এসো। একদিন পুরো ছুটি দিচ্ছি—মাইনে পাবে পুরো, খোরাকীও মারা যাবে না। যাও।'

তেমনি শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নির্বিষ কণ্ঠস্বর।

কানু দমে যায়। কতখানি মনের জোর থাকলে মানুষ এমনভাবে ছেড়ে দিতে পারে।

পরমহরি সুর টেনে টেনে বলে, 'সেদিন আর নাইবে নাতি, থাবা থাবা চিনি খাতি! যুদ্ধ শেষ হয়েছে, লোকের হাতে টাকাও টু-টু। খাবারটা খাচ্ছে কে বাপ? এই জিলিপি আর সিঙ্গাড়া বেচে কত লাভ হয় খতিয়ে দেখেছ কি? দেখছ তিনটে ধুনী জ্বলছে, এত লোক খাটছে—আর বুড়ো মড়া বসে বসে টাকা গুনছে—বড্ড বুঝি লাভ! এর খরচাটা ভেবে দেখেছ কি? এতগুলো লোকের খোরাকী? কয়লা পোড়ে কত মাসকাবারে? চিনি. কিনতে হয় ব্লাকে, ময়দাও তাই। কত লাভ থাকে হে ঠাকুর?'

এইবার তার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে আসে, 'যাও যাও কাজে যাও। ছানা এসে পড়ে আছে এক গাদা। সব মেখো পারবে না। চটপট লেগে পড়ো। কাল তিন শ' পান্তুয়ার অর্ডার আছে। যাও যাও! ঢের সর্দারি হয়েছে।'

সে চোখ নামিয়ে আবার পয়সা গনে।

কানুকে সত্যিই গিয়ে কাজে লাগতে হয়। সাহস হয় না ওর সত্যি

এ কাজ ছাড়তে। নিরাপদ আশ্রয় ও আহার। বড় অসময়ে আশ্রয় দিয়েছে, এটাও ঠিক।

কে জানে, সত্যিই কাজের বাজার কি রকম। হয়ত বুড়োর কথা ঠিক, নইলে অত ওর বুকের জোর হয়!

তেরো বছরের ডাগর মেয়ে, ফরসা তার রং, টানা চোখ—লক্ষ্মী প্রতিমার মত তার চেহারা। কোন্ ভাগ্যবানের অদৃষ্টে আছে ঠিক কি! হয়ত কোন চাকরে'বাবুই দেখতে পেলে লুফে নেবে।

হ'ল না। ওর ভাগ্যে আর হ'ল না। এখনও দীর্ঘকাল ওকে এখানে যুঝতে হবে। এই রাবণের চিতার সঙ্গে। একফোঁটা একফোঁটা করে দেহের সব রক্ত নিংড়ে বার করে নেবে। তারপর, যদি এর ভেতর অসুখ-বিসুখ না হয়, টাকা যদি জমে তো কোন সুদূর ভবিষ্যতে দেশে গিয়ে মুদীর দোকান দেবে—কিন্তু সে কি হাজার টাকার কমে হবে?...... হাজার টাকা জমতে ওর অন্তত আরও বারো চোদ্দ বছর। ততদিন কি আর কোন মেয়ে জুটবে ওর? জুটলেও, এই বলিষ্ঠ পুরন্ত দেহ, বর সাজবার মত সুন্দর চেহারা কি ওর আর থাকবে?

আপাতত সে চিন্তা থাক। ছানাগুলোর জাঁক দিতে হবে। ঢের কাজ এখনও বাকী। এই উনুনেই আজ পান্তুয়া হবে, তা ছাড়াও গজা বালুশাহী লবঙ্গলতিকা—সব চাই। আজ শনিবার গেল—দোকান খালি; কাল আবার রবিবার, ভোরবেলাই সব চাই। সকালে জিলিপি কচুরী ভাজতে ভাজতেই নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর মিলবে না।

'রসটা চাপা রে!' হেঁকে বলে মেধো।

কমা ও সেমিকোলন

রাবণের চিতা জ্বলছে গণ্ গণ্ করে। কী তাত, সামনে যেন চলা যায় না। তবু বসতেই হয়। আজ বোধ হয় রাত তিনটে বাজবে শুতে। কানু গিয়ে রসের গাদ কাটাতে বসে। কাপড়ের ওপর তেল-চিটচিটে গামছাটা জড়িয়ে নেয়।

কাজের ভীড়ে দিদির চিঠির কথা আর মনে থাকে না ওর খানিক বাদে।

রেশন

ললিতা উদ্বিগ্নমুখে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এবার নিয়ে বোধ হয় সতেরো বার হবে। তবে ভেতরের টানটা আর নেই। খুকীটা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, জ্বালাতন করছিল টেবি আর খোকাই বেশি—তারাও এইবার ঘুমিয়ে পড়েছে, সেদিক দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত এখন। ছুটে আবার এখনই ভেতরে যেতে হবে না।

নিশ্চিন্ত!—তাই বটে। এই দুঃখের মধ্যেও ম্লান হাসি ফুটে উঠল ললিতার মুখে। রাত নটা বাজল। ওদের এ গলি নির্জন হতেই চায় না সহজে কিন্তু সেও ক্রমশ জনবিরল হয়ে উঠল। কতকটা সেই জন্যেই সে এবার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। আর একটু পরে ভয় করবে এখানে থাকতে এটাও ঠিক।

কিন্তু—নিখিল?

পাঁচটায় ছুটি ওদের অফিসে, কদাচিৎ দু পাঁচ মিনিট দেরি হয়। সেখান থেকে হেঁটে আসতে বড়জোর আধ ঘণ্টা, বাজারে ঢুকলে না হয় সবসুদ্ধ একঘণ্টা হোক—তাহ'লেও এত দেরি হওয়ার কোন কারণ থাকে না। সাতটা থেকেই ললিতা সুরু করেছে ঘড়ি দেখতে, আর বার বার বাইরে এসে দেখছে উঁকিমেরে—ওদের গলিটা বহুদূরে যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে সেখানকার পানের দোকানের ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় নিখিলের বহুপরিচিত মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে কিনা। তবু তখনও সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি যে সেই প্রতীক্ষা এতক্ষণ পরেও ওর তেমনি

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অথচ আজই নিখিলের সবচেয়ে সকাল করে ফেরবার কথা। বাড়ীতে কিছুই নেই তা সে জানে। বাজার না হোক —অন্তত একটু আলুও চাই ত। টেবিটার সাতদিন জর, তার বার্লি আনতে হবে। যেটুকু ছিল, কোনমতে সকালে খাওয়াতেই শেষ হয়ে গেছে। ওপরের সোনা বৌদির কাছ থেকে একটু বার্লি চেয়ে এনে প্রচুর জল মিশিয়ে তৈরি করে রেখেছিল, তাই দুপুরে আর সন্ধ্যায় চলল। মানতে কি চায়? ক্ষিদের জন্যেই আরো ঘুমোতে চাইছিল না মেয়েটা। কিন্তু ওপরে নিচে এমন কোন ভাড়াটে নেই যার কাছ থেকে একাধিকবার বার্লি ধার করা না হয়েছে—কখনও না কখনও। সোনা বৌদির কাছেই এর ভেতরে তিনবার হয়ে গেছে। নেহাৎ আজ 'না' বলতে পারেন নি বটে কিন্তু এমনই দিয়েছেন একবারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অথচ এমন তুচ্ছ জিনিস—ফেরৎ দিতে গেলেও ওঁরা নেননা—চক্ষুলজ্জায় বাধে। তাছাড়া ওর ত কোন মাপ-জোপও থাকে না—ফেরৎই বা কি-হিসাবে দেওয়া যায়?

কী হ'ল নিখিলের? একদৃষ্টে গলির মোড়টার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে। দুচার জন যা পথিক এখনও হাঁটছে-রাস্তা দিয়ে তারা ওকে অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময় বোধ করছে, এক আধজন ইতস্তত ও করছে একটু, অর্থাৎ কোন বিপদ ঘটেছে কি না, সাহায্য করার কোন প্রয়োজন আছে কি না জানতে চায়—কিন্তু এ পক্ষ থেকে কোন উৎসাহ না পাওয়ায় সে প্রশ্ন করা হয় না শেষ পর্যন্ত, কৌতূহলী হয়েই ফিরে যায়।

ললিতার এসব দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কী হ'ল তার কে জানে! কোন দুর্ঘটনা ঘটল কি? কে-ই বা খবর নিতে যায় এখন? কোথায় খবর নেবে তাও বুঝতে পারছে না, ওপরে তেমন কেউ নেই-ও। সোনা

কমা ও সেমিকোলন

বৌদির দেওর রঞ্জু থাক্‌লেও না হয় কথা ছিল—কিন্তু আজ তার কারখানায় 'ইভিনিং ডিউটি', সে রাত বারোটায় বাড়ী ফিরবে। আফিসেই কি কোন কারণে আট্‌কে পড়ল? এ রকম দু একবার হয়েছেও, আগে আগে—হিসেব মেলেনি, বিলেতে কি সব হিসেব পাঠাতে হবে, এমনি নানা কারণে। কিন্তু তাও এত দেরি, রাত সাড়ে নটা-দশটা ত কখনও বাজেনি।

ললিতার চোখের জল যেন কিছুতে বাধা মানে না আর। ডাক ছেড়ে একটু কাঁদতে পারলেও খুশি হ'ত সে; ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে—দ্বিতীয় এমন একটা লোক নেই যার কাছে সে একটু কেঁদেও সুস্থ হতে পারে।

যে অবস্থায় ওরা আছে তার ভেতর কোন বিপদ-আপদের কল্পনা করলেই গা হিম হয়ে থাকে। আজ আর একটা পয়সা কোথাও এমন নেই, বিশেষ কারণে যা বার করা যায়।

নিখিল লেখাপড়া শেখেনি। সুপারিশের জোরে বিলিতি মার্চেন্ট অফিসে চাকরীতে ঢুকেছিল দপ্তরীর কাজে। তারপর অবশ্য নিজের চেষ্টায় এবং বড়বাবুর বেগার দিয়ে য়্যাকাউন্টস্-এ এসেছে এতকাল বাদে—কিন্তু মাইনে এতদিনে নিরানব্বই-এর বেশি ওঠেনি। মাগগি-ভাতা টাতা নিয়ে মাস গেলে সওয়াশ' পাবার কথা কিন্তু প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আর অফিসের দেনা কেটে কোন মাসেই পুরো একশ'টি টাকা ঘরে আসে না। এ দেনা কবে ও কী প্রয়োজনে সুরু হয়েছিল, সে হিসেব বোধ হয় নিখিলেরও নেই। সারা বছর ধরে শোধ করে এনে পূজোর সময় হালকা হবার কথা, কিন্তু প্রতি বছরই পূজোর সময় আবার ধার করতে হয়। এটা কিছুতেই বন্ধ করা যায়নি, শত চেষ্টাতেও না। পূজোর জামাকাপড় বলে নয়—এমনি

ব্যবহারের কাপড় জামাও ত লাগে। তাছাড়া কোথা থেকে কেমন করে যে বাড়তি খরচ দেখা দেয় সে সময়, আজ অবধি তার কোন হদিশ পায়নি ললিতা।

এই একখানি ঘর এবং চলনের এক প্রান্তে একটু রাঁধবার জায়গা—তাই ত্রিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। তাও প্রতিদিন বাড়ীওয়ালার স্ত্রী মল্লিক-গিন্নী শোনান্, 'ঐ ত ললিতারা, রাস্তার ধারের সেরা ঘরখানা দখল করে বসে আছে। ওরা যদি ওঠে ত ঐ একখানা ঘরে আমি সত্তর টাকা ভাড়া পাবো। ওঠাতে কি আর পারি না? না হয় দুমাস চারমাস মামলা মকদ্দমাই করতে হবে, সে খরচাটাও সেলামী বলে নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে আদায় করা যায়। কিন্তু সে পিরিবিত্তি, ভগবান না করুন, কখনও না হয়। এমন পয়সায় আমার দরকার নেই। পুরোনো ভাড়াটে এতকালের, অন্যায় করে উৎখাত করতে চাই না। কিন্তু ওদেরও ত একটা বিবেচনা থাকা দরকার ভাই? আমার এই চারদিকের খরচা বাড়ছে, আমি চালাই কী করে। পাঁচটা টাকাও কি বাড়াতে পারে না ওরা? হা রে ধম্ম!'

ধর্মই জানেন—পাঁচটা টাকা কেন, এক টাকাও বাড়াবার সামর্থ্য নেই ওদের।

রেশন তেল মশলা ডাল কয়লা ঘুঁটে নাপিত ইত্যাদি কোন্ খরচাটা কমাবে ললিতা? তাই ডাল ভাত এবং একটা তরকারী এ ছাড়া গত এক বছরে কোনদিন খেয়েছে বলে মনে পড়ে না ললিতার! মাসে একদিন মাছ আসত, মাইনে পাবার পরের দিন—তাও বন্ধ করে দিয়েছে ললিতা। মিছি মিছি অভ্যাস খারাপ ক'রে দরকার নেই। ও স্বাদ ভুলে যাওয়াই ভাল।

কমা ও সেমিকোলন

তবুও কুলোয় না কিছুতেই। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে দেখেছে সে। ধোপার বাড়ী কাপড়-জামা যায় না বহুকাল। শুধু নিখিলের জামাটা এক আনা দিয়ে ইস্ত্রি করিয়ে আনে। আর কোন্ খরচা কমাবে? এর ভেতরে মাস-তিনেক নিখিল একটা টুইশ্যন করেছিল—সাত টাকায়। তবু যেন নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল ললিতা, কিন্তু গত মাস থেকে তাও নেই। তার ওপর এই ছেলে-মেয়েদের অসুখ—নাহক্ চার-পাঁচটা টাকা খরচ হয়ে গেল বেশি। তার ফলে একেবারেই হাত শূন্য হয়ে গেছে ওদের। সপ্তাহে পাঁচ টাকার রেশন লাগে—টাকার অভাবে রেশন নেওয়া হয়নি আজ। কাল শনিবার, কাল না নিলে রেশনটাও মারা যাবে, এধারে ঘরেও এমন কিছু নেই যা খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে ওরা। রেশনটা যদি মাসের প্রথমে একেবারে দিয়ে দেয় ত এ সমস্যায় অন্তত পড়তে হয় না। কিন্তু এখন, উপবাস করা ছাড়া আর কোন উপায় করা যাবে না।

পাঁচটা টাকা আজ নিখিলকে ধার করতেই হবে। আর সেই সঙ্গে আরও এক টাকা। মঙ্গলবার মাইনে হবে, এই কদিনের মত একটুখানি ডাল আর কিছু আলু—এটাও ত চাই।

অবশ্য দেরি হবার সেও একটা কারণ হতে পারে। অফিসেও ধার করতে আর বাকী নেই কারুর কাছে। কাউকে কাউকে শোধ দেওয়া হয়েছে—কেউ এখনও পাবে। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, বিনোদ বাবুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার করে সতীশবাবুকে শোধ দিতে হয়, আবার দুমাস পার সতীশ বাবুর কাছ থেকে সেই পাঁচ টাকাই এনে বিনোদ বাবুর কাছে ঋণমুক্ত হতে হয়। ফলে নতুন কারুর কাছ থেকে ধার পাওয়া শক্ত, সে রকম নতুন লোক বোধ হয় অফিসে আর খুঁজেই পাওয়া যাবেনা। তবে কি সেই টাকার জন্যই এত দেরি হচ্ছে?

কমা ও সেমিকোলন

টং করে ওপরের ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজবার শব্দে চকিত হয়ে উঠে ললিতা মনে মনে ঐ প্রশ্নই করে। রেশন যে নিতেই হবে নিখিল তা জানে—আর সে টাকা আজ রাত্রের মধ্যেই চাই। কাল শনিবার রাত চারটের সময় উঠে রেশনের দোকানে লাইন না দিলে অফিসে যাবার আগে রেশন তুলতে পারবে না ঘরে। এমনিতেই হয় ত সে ভাত খেয়ে যেতে পারবে না। যত ভোরেই যাক—তারও আগে দেখা যায় অন্য লোক গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে। ফলে রেশন বাড়ী এনেই জামা গায়ে দিয়ে ছুটতে হয়। দু-একদিন তাও পারেনি ইতিপূর্বে, ওপরের রঞ্জুর খোসামুদি করে আনাতে হয়েছে বেলায়—

হ্যাঁ—টাকার জন্য দেরি হতে পারে বটে। ছ'টা টাকা ধার পাওয়া নিখিলের পক্ষে আজকাল আর সহজ কথা নয়। অফিসে দুর্নাম রটে গেছে হাত-ভারি বলে। তবু ধার যদি করতেই হয় ত অফিস থেকেই করতে হবে। আর কোথাও কোন লোক এমন নেই, যার কাছ থেকে ছ টাকা কেন ছ আনাও জোগাড় হবে। কিন্তু অফিসে যে ধার দেবে সে-ত ছুটির আগেই দেবে—ওর জন্য রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকবে না ত! হয়ত কারুর সঙ্গে বাড়ী যেতে হয়েছে টাকার জন্য—মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে ললিতা—টালিগঞ্জ কি বেহালা কি বড়শে। তবু, তবু—এত রাত কেন হবে? ট্রাম-বাস্‌ও ত বন্ধ হয়ে এল। অতদূরে কোথাও গেলে কি ট্রামে ফিরবে না অন্তত?

হে মা কালী, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দেবে ললিতা। তার টাকায় কাজ নেই, রেশনে কাজ নেই, না হয় তিনদিন উপবাসই করবে ললিতা—নিখিল শুধু ফিরে আসুক ভালয় ভালয়। আর যে ভাবতে পারে না সে। হে ভগবান, হে সত্যনারায়ণ, এ কী করলে? তুমি কি বড়লোকেরই

ঠাকুর, গরীবের কেউ নও ?······ললিতা মাথা খুঁড়তে থাকে চৌকাঠটায় ঢিব ঢিব করে পাগলের মত।

এগারোটা!

ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়। কপালটা ফুলে উঠেছে ঢিবি হয়ে, চোখের জলে আর কাদায় মুখে বিশ্রী দাগ, ঘামে সিঁদুর মুছে গিয়ে সারা কপালটাই রক্তাভ হয়ে উঠেছে। তা হোক্—

তবু ললিতা নিজেই খুঁজতে যাবে। কোথায় যাবে? তা জানে না সে। সারারাত কলকাতার পথে পথে ঘুরতে হয় সেও ভাল। এমন করে অপেক্ষা করতে আর সে পারবে না।

সে বাইরে আসতেই নজরে পড়ল শ্রান্ত পদে, প্রায় টলতে টলতে কে একজন আসছে গলির মোড়ে। পান-বিড়িওলার জোর আলোটা নিভে গিয়েছে, নইলে এখান থেকেই চেনা যেত। তবু বড় রাস্তায় গ্যাসের আলোর আভাতে মূর্ত্তিটার যে ছায়াভাস পাওয়া যায়—সেটাকে যেন চেনা মনে হয়। বুকটা ঢিব ঢিব করে ওঠে ললিতার। জয় মা কালী!—হাঁ নিখিলই ত।······কিন্তু ও অত টল্‌ছে কেন? যেন চলতে পারছে না! তবে কি—অস্পষ্ট একটা আশঙ্কায় ললিতার হাত পা যেন মুহূর্ত্তে হিম হয়ে আসে—তবে কি নিখিল কোথাও থেকে নেশা করে এসেছে? ললিতা শুনেছে এমন হয় অনেকের—সর্বপ্রকারে হতাশ হ'লে মানুষ এমন করে বসে। হয়ত কোথাও টাকা জোগাড় করতে না পেরে নিখিল শেষ পর্যন্ত ···দ্রুত নেমে আসে ললিতা রাস্তায়।

'হ্যাঁ গো, কী হয়েছে গো? এ কী বেশভূষা, অমন করছ কেন?'

বেশভূষাও বিচিত্র বৈ কি। জামাটা গুটিয়ে বগলে চাপা, জুতো জোড়া হাতে। ওদের বাড়ীর কাছাকাছি যে গ্যাসের আলোটা জ্বলে, তারই সামনে তখন এসে পড়েছে নিখিল, ললিতা আরও ভাল ক'রে দেখতে পায় ওকে। সমস্ত গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গিয়েছে, মুখটা পাঁশ্-পানা। বিবর্ণ ও শান্ত। ললিতা ওর একটা হাত ধরতে যায় তাড়াতাড়ি।

'রাস্তায় নেমে এসেছ কেন? চলো চলো ঘরে চলো—' নিখিলের কণ্ঠস্বর যেন একটু বিরক্ত, রুক্ষ। কিন্তু পরক্ষণে তারও নজর পড়ে ললিতার মুখের দিকে। শিউরে উঠে প্রশ্ন করে সে, 'তোমার একি হয়েছে! কপালটা অমন করে ফুল্ল কেন? পড়ে গিয়েছ?'

ললিতা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলে বলে, 'হ্যাঁ। ও কিছু না। ঘরে চলো।'

ঘরে ঢুকেই নিখিল জামা আর জুতোটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ে মেঝেতে।

ললিতা পাগলের মত পাখা খোঁজে একটা। তাড়াতাড়ি ও উদ্বেগে কিছুই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না, শেষে উনুনে হাওয়া করার ভাঙা পাখাটা টেনে এনে নিখিলের ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে, 'হ্যাঁ গো কী হয়েচে গো, অমন করছ কেন?······বলনা খুলে—আমি যে আর ভাবতে পারি না।'

'তুমিই বা অমন করছ কেন? ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তার ওপর আজ যা গুমোট্ গরম। তোমরাই আমায় পাগল ক'রে তুল্‌বে—' নিখিলের কণ্ঠস্বর আবার উষ্ণ হয়ে ওঠে।

ললিতা অপ্রতিভ হয়ে বাতাস করে তাড়াতাড়ি।

চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে রইল নিখিল—তেম্‌নি এক ভাবে। অনেক,

কমা ও সেমিকোলন

অনেক, অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে চেয়ে উঠে বসে। যেন এই সময়-টুকুর মধ্যেই চোখ ওর তন্দ্রায় ভারি হয়ে এসেছে।

বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করে এবার, 'একটু চা বোধ হয় আর এখন হওয়া সম্ভব নয়, না?'

ললিতা বিপন্ন ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, 'সবাই ত শুয়ে পড়েছে ওপরে, তা ছাড়া এখন কি আর কোথাও আগুন আছে কারুর ঘরে? একটু কাগজও নেই ছাই যে জ্বেলে…ক'খানা ঘুঁটে জেলে ক'রে দেব?'

'না না থাক্।...সাড়ে পাঁচ আনা শয়ের ঘুঁটে। দরকার নেই।'

অত্যন্ত মন্থর ভাবে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় নিখিল। যেন কোনমতে ছড়িয়ে পড়া দেহটাকে জড়ো করে নিয়ে ওঠে, অনেক চেষ্টা ক'রে। গেঞ্জিটা খুলে ও-পাশের দড়ির আলনায় মেলে দেয়। তারপর ঘটী-বালতিটা নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে বহুক্ষণ ধরে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে পা ধোয়। মুখে চোখে জল দেয়, ঘাড়ে জল থাবড়ায় জোরে জোরে।

ওর বাড়ীতে-পরার ছেঁড়া পাট-করা কাপড়টা এনে দেয় ললিতা ততক্ষণে। কাপড় ছেড়ে দিয়ে ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে নিখিল একটু ভয়ে ভয়েই—'জল কী রকম আছে, কাপড়টা কেচে দেব?'

ললিতা ঘাড় নেড়ে বলে, 'আরও এক বাল্‌তি ধরা আছে, ওদের চৌবাচ্চাতেও জল আছে খানিকটা। তুমি সরো, এই বাকী জলটাতেই আমি কেচে নিচ্ছি।' ললিতাই কাপড় কেচে শুকুতে দেয়। ঘরের মধ্যেই সব দিতে হয়। একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকার মাহাত্ম্যই এই—ঘরের বাইরে আর কোন স্থানেই কোন অধিকার নেই ওদের—

তারপর আসন পেতে ঠাঁই ক'রে ওকে খেতে দেয় ললিতা। খানছয়েক

শুক্‌নো শক্ত হয়ে যাওয়া রুটি এবং জলের মত একটুখানি ডাল,সামান্য একটু ভেলি গুড়। এরকম খাবার ধরে দিতে আজও লজ্জা হয় ললিতার কিন্তু উপায় কি? খেতে খেতেই ঢুলুনি আসে নিখিলের। চম্‌কে উঠে আবার এক গ্রাস ছিঁড়ে মুখে দেয়।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ললিতা আর কৌতূহলটা কোনমতে দমন করতে পারে না। কেমন এক রকম চাপা কান্নার সুরে, অর্দ্ধেক করুণ, অর্দ্ধেক আর্ত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে আমায় বলো-নাগো, আমার মাথা খাও। সন্ধ্যে থেকে ভেবে ভেবে যে পাগল হয়ে উঠলুম! আর কত ভাববো?'

নিখিলের ঘুম এবার ভেঙে যায় ভাল ক'রেই, সে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে 'ভাবো কেন মিথ্যে মিথ্যে? আমার মত গরীব লোকের কি সন্ধ্যে থেকে ঘরে এসে বিশ্রাম করার কথা?'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে একটা রুটির টুকরো দলা পাকাতে পাকাতে বললে, 'আমার এখন থেকে এমনি রাতই হবে রোজ, চাই কি আরও বেশি হ'তে পারে। অমন ক'রে ভেবো না।'

তারপর কেমন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে অকস্মাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'কিন্তু তোমারও মুখ চোখ বসে গিয়েছে, চোখ লাল, কেঁদেছ বুঝি বেশি? কপাল ফুলল কেন? মাথা খুঁড়েছিল নাকি? ঠিক ক'রে বলো ত!—'

'না না, ও ঠুকে গিয়েছিল এমনি, কিন্তু তুমি বললে না ত—কেন রাত হলো বা হবে?'

নিখিল প্রাণপণে প্রশান্ত হবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'আমি যে রিক্সা চালাচ্ছি ললিতা। আজ থেকে শুরু করেছি—'

কমা ও সেমিকোলন

বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকে ললিতা—মুখ দিয়ে ওর কথা বেরোয় না।

'কী! কী করবে?'

'রিক্সা চালাব, আজই চা[ি]য়েছি।'

'তার—তার মানে?'

'বাংলা কথার মানে বোঝ না?'

সত্যি না ঠাট্টা—তিক্ততা, বুঝতে পারে না এখনও ললিতা, চুপ করে চেয়েই থাকে।

নিখিলও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে উঠে পড়ে। সব রুটিগুলো খাওয়া হয় না ওর। কিন্তু ললিতাও আর অনুরোধ করতে পারে না। কথাটা এখনও সে বুঝতে পারে নি এটা ঠিক, তবু কিসের একটা আশঙ্কায়, অজ্ঞাত কী একটা অমঙ্গলের আভাসে, কাঠ হয়ে বসে থাকে সে।

নিখিল আঁচিয়ে উঠে পকেট থেকে তিনটি টাকা বার করে ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সহজ ভাবেই বলে, 'সব কার্ডগুলোর রেশন নেওয়া যাবে না ওতে, দুখানা অন্তত নেওয়া যাবে মনে হচ্ছে। তাইতেই সোমবার পর্যন্ত চালিয়ে নাও। আবার সোমবার নেব রেশন।'

তবু ললিতা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। প্রশ্নও করতে পারে না এ টাকা কোথা থেকে এল।

কিন্তু নিখিলই এবার কথাটা বলে। কোথা থেকে একটা পোড়া বিড়ির টুক্‌রো সংগ্রহ ক'রে ধরাতে ধরাতে বললে, 'অফিসে কোথাও কারুর কাছ থেকে একটি টাকাও ধার পেলুম না; সবাই বললে—মাসের শেষ, কোথা পাবো। অনেকেরই রেশন নেওয়া হয়নি নিজেদেরই। শেষ পর্যন্ত বেয়ারাদের কাছে হাত জোড় করেছি, কেউ বিশ্বাস করতে পারলে না। টাকা পিছু দু আনা সুদ দিতে চেয়েও না। তখন বেরিয়ে পাগলের মত

কালীঘাটের দিকে হাঁটতে লাগলুম। ভেবেছিলুম, কালীঘাটের মন্দিরে বসে ভিক্ষা করব। মরীয়া হয়ে গিয়েছিলুম। তুমি আমি উপোসী থাকতে পারি, কিন্তু তিনটে শিশু—ভাবতেই যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়, রক্ত উঠতে থাকে মাথায়।······পিসীমার কাছে বালিগঞ্জে যাবো কিনা ভেবেছিলুম একবার, কিন্তু গতবারের কথা মনে ক'রে আর প্রবৃত্তি হ'ল না।··· পাগলের মত হাঁটছি, হঠাৎ নজর পড়ল একটি রিক্সাওয়ালার দিকে, সে যেন কেমন এক রকম সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনে হ'ল। কথাটা মনে পড়ে গেল বিদ্যুৎ-চমকে। কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, ওকে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, ভাই, কাছাকছি কোথাও রিক্সা চালানোর কাজ খালি আছে জানো?······সে ত বিশ্বাসই করে না—যখন করলে তখন বললে, তারই ভাইয়ের অসুখ, সেই রিক্সাখানাই পড়ে আছে—এখনই দিতে পারে। কিন্তু জমার টাকা? মালিককে জমা দিতে হবে যে।······সেই সময় বোধ হয় আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার কী দয়া হ'ল নিজের জামিনে সে রিক্সা বার করে দিলে।'

ললিতা শিউরে উঠে বললে, 'তুমি সত্যি সত্যিই রিক্সা টানলে!'

'টানলুম বৈ-কি!······জামা আর জুতো খুলে সেই রিক্সারই সিটের নিচে রেখে চলে গেলুম টালিগঞ্জের দিকে। ভাগ্যফল—সাড়ে চার টাকা হল রাত দশটার মধ্যেই। জমার দেড় টাকা দিয়ে তিন টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরলুম।'

হ্যারিকেনের শিখাটা বহুক্ষণ ধরে জ্বলে জ্বলে ক্রমে স্তিমিত হয় এল। রুটি আর গুড়ে কোথা থেকে রাজ্যের লাল পিঁপড়ে সার দিয়েছে। কিন্তু সেসব কোন দিকে ললিতার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যে কী ভাবছে তাও সে

জানে না—শুধু নিখিলের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে বসে আছে এক-ভাবে।

অনেকক্ষণ পরে নিখিলই কথা কইলো, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয় না কিছুতেই, চেষ্টা ক'রে বিকৃত হয় মাত্র, সে বললে, 'শুয়ে পড়ো ললিতা। আজ আর খেতে পারবে না তা জানি।······কিন্তু দুঃখ কি! ধার করা, ভিক্ষা করা—পাঁচটা টাকার জন্যে বেয়ারার কাছে হাত পাতার চেয়ে এ ঢের ভাল। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে হয়ত—কাল ববং একটু জল গরম করে দিও। নুন-জল লাগালে ব্যথা কমে যাবে। সেই রিক্সাওলাই বলে দিয়েছে।'

নিখিল শুয়ে পড়ল নিজে। কিন্তু ললিতা তবুও উঠতে পারল না। হ্যারিকেনের শিখাটা এক সময় নিভে গেল।

মহাপ্রয়াণ

ঘটনাটা খুবই শোকাবহ, তাতে সন্দেহ নেই। রায় বাহাদুর কৃষ্ণকালী বসুর বড় ছেলে মণি হঠাৎ দিন-পাঁচেকের বাতজ্বরে মারা গেল।

ছেলের মত ছেলে মণি। দেখতে ত খুবই সুপুরুষ, এই মাত্র বছর দুই আগে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে পাশ করে মোটা মাইনের সরকারী চাকরীতে ঢুকেছে। এমন ছেলে অথচ একটু অহঙ্কার নেই, তাকে নিয়ে তার বাপ-মায়ের অহঙ্কারের অবধি ছিল না, কিন্তু মণি নিজে সকলের সঙ্গে সহজে মিশত। তার মুখেব মিষ্টি হাসি যে একবার দেখেছে, সে আর কখনও ভুলবে না। মণির নিজের বিশেষ বিদ্যা ছাড়াও পড়াশুনো ছিল সব দিকেই—সেজন্য অধ্যাপক থেকে শুরু করে অনেক বিশিষ্ট লোকই তাকে সমীহ করতেন। পাড়ার ছেলেদের কাছে ত সে দেবতা, সব ব্যাপাবেই ওকে তারা দলপতি করে কাজ করত, ও ছিল তাদের পাণ্ডা। মণিদাকে নিয়ে তাদের গর্বের শেষ ছিল না; আর এত রকম প্রতিষ্ঠানও মণি গড়েছিল! এত খাটতেও পারত! ওর মা প্রায়ই লোকের কাছে বলতেন, 'একটা ত মোটে মাথা, এতগুলো কথা মণি মনে রাখে কি করে তাই ভাবি।'

শুধু ঘরের কোণে বসে পড়াশুনোই করেনি। খেলাধূলো ব্যায়ামেও সে কম যেত না কারুর চেয়ে। সেজন্য তার দেহটিও ছিল সুন্দর—লোকের ঈর্ষা করবার মত। সেই মণির এমন অকস্মাৎ মৃত্যু হবে, তা কে ভেবেছিল! তাও বাতজ্বরে!

কমা ও সেমিকোলন

কথাটা অবিশ্বাস্য। বড় বড় ডাক্তার ডাকবারও অবসর পাওয়া গেল না। শোকের প্রথম বিহ্বলতা কাটলে রায় বাহাদুর বার বার সেই কথা বলেই কাঁদতে লাগলেন,'ওরা আমাকে বললে না কেন একবার যে, রোগটা এত সীরিয়স্।······আমি বিধান রায়কে ডাকতে পারতুম, ডেনহ্যাম হোয়াইট্ আমার পার্সোনাল ফ্রেণ্ড, তাকে টেলিগ্রাম করতুম সে এয়ারে এসে দেখে যেত দার্জিলিং থেকে। আমি বড় হোমিওপ্যাথও কাউকে ডাকতে পারতুম। আমার আবার ডাক্তারের অভাব! আমার নাম শুনলে যাকে ডাকা হ'ত সেই আস্ত।······এ যে আমি কিছু বুঝতেই পারলুম না। হায়, হায়—ছেলেটাকে বেঘোরে হারালুম!······এ আমার কী হল!·········আমায় কেবল ওরা বুঝোলো যে ও কিছু নয়, সেরে যাবে!'······

রায় বাহাদুরের ভাই চুণীবাবুও বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'হয়ত বাছা বাঁচত না, পরমায়ু ছিল না, যেতই—তবে এতটা আফশোষ ত থাকত না। বোম্বের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আমার ফ্রেণ্ড্—আমি সব ক'জনকে এনে হাজির করতে পারতুম।······এ তোমরা কী করলে দাদা?'

সত্যিই চুণীবাবু বোম্বের মস্ত বড় ব্যবসায়ী, তাঁর প্রতিপত্তি কত। এই ছেলেটি ছিল তাঁরও নয়নের মণি। আর রায় বাহাদুরের ত কথাই নেই। গভর্ণমেণ্টের অত বড় পদস্থ কর্মচারী—মিনিস্টাররা পর্যন্ত তাঁকে খাতির করেন। সমস্ত বাঙলা দেশটা বলতে গেলে ওঁর হাতের মুঠোয়। তাঁরই একমাত্র ছেলে মারা গেল মাত্র দুজন সাধারণ এম-বি ডাক্তারের হাতে—এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস আর কী হতে পারে!

পাড়ার লোক বলতে লাগল, 'উচিত কিরণ ডাক্তারকে জেলে দেওয়া!'

'ওদের দফা সারা হয়ে গেল—চিরদিনের মত।' একজন বললেন।

কমা ও সেমিকোলন

কিন্তু তাতে কি আর মণি ফিরবে ?

মণি মারা গেল রাত নটার সময়। কথাটা বিশ্বাস করতে এবং শোকের প্রচণ্ডতা কাটতে কাটতে রাত বারোটা বাজল। এবার আসল কথাটা না পাড়লেই নয়। পাড়ার লোকেরা উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। শেষে প্রবীণ গোছের একজন এগিয়ে গিয়ে মণির বড়মামা হিতেনবাবুকে ধরলেন, 'হিতেনবাবু……শোক যতই হোক্—এধারেও কর্তব্যের ত্রুটি হতে দেওয়া ত চলতে পারে না। যদি অনুমতি করেন ত—'

মাথায় হাত দিয়ে একপাশে বজ্রাহতের মত বসে ছিলেন হিতেনবাবু, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন মুখ তুলে।

'য়্যাঁ ?'

'বলছি, তাহলে এবার উয্যুগ্‌ আয়োজন ত করতে হয়—'

হিতেনবাবু অসহায়ভাবে ভগ্নীপতির মুখের দিকে চেয়ে ডাকলেন, 'কেষ্ট—'

কান্নায়-ভাঙা গলায় রায় বাহাদুর বললেন, 'কি বলছ হিতু ?'

'এঁরা বলছিলেন—'

'হ্যাঁ—এঁরা কী বলছিলেন ?' আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করেন রায় বাহাদুর।

'এঁরা বলছিলেন যে, এবার তাহ'লে—মানে—যদি···এদিকেও ত প্রস্তুত হ'তে হয়।'

'না না', আকুলভাবে যেন আর্তনাদ করে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'ওরে বাপ্‌রে, এই অন্ধকার রাত্রে বাবাকে আমার কোথায় পাঠাবো !··· না না হিতু, মণি আমার ভয় পাবে যে ! সকাল হোক্।'

তারপর একটু কান্নার বেগ কমলে আবার বল্‌লেন, 'তা ছাড়া, খোকা ছিল এ পাড়ার রাজা, আন্‌ক্রাউন্‌ড্ কিং, রাজার যোগ্য সমারোহে ওকে পাঠাতে হবে ভাই!'

অগত্যা সবাই চুপ করে গেলেন। স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে রায় বাহাদুর ডাকলেন, 'মন্মথ!—ওরে কে আছিস রে?'

রোরুদ্যমান দু তিনটি চাকর এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। দাদাবাবুকে তারা ভালবাসত।

'ওরে এসেছিস্, মন্মথ, আমার সিগারেটের কৌটোটা আথ্ ত—আর দেশলাইটা।'

মন্মথ সিগারেটের কৌটোটা এনে হাতে দিতে রায় বাহাদুর অদ্ভুত একটা হাসি হাসলেন, পাগলের মত।

'কাঁদছিস্ তোরা? কাঁদ্ কাঁদ্। আথ্ যদি তোদের কান্নায় তোদের দাদাবাবু ফেরে আবার। নিষ্ঠুর সে, বাপ-মায়ের কান্নায় তার মন ভিজল না। ওহো, বাপ্ রে!'

সিগারেট ধরাতে হাত কাঁপে থর্ থর্ করে। তবু সিগারেট ধরিয়েই একটু যেন সুস্থ হ'লেন রায় বাহাদুর। কাকে যেন কৌটো আর দেশলাইটা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন হিতেনবাবুর কাছে দিতে—

রাত্রে নিয়ে যাওয়া হবে না শুনে একে একে পাড়ার লোকেরা অনেকেই বাড়ী চলে গেল। দু একজন, যারা রায় বাহাদুরের একটু বেশি অনুগত, তারা এদিক ওদিক মুড়িসুড়ি দিয়ে বসল। কেউ লাইব্রেরীতে, কেউ বারান্দায়, দু একজন মৃতের ঘরের পাশের ঘরটায়—যে যেখানে পারলে আশ্রয় নিলে। আত্মীয়রাও অনেকে এসে পড়েছেন। মেয়েরা এই দুঃসহ শোকের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে বাধ্য হয়েছেন—তবে

শোবার জায়গা দেওয়া যায় নি। ছেলেগুলো যেখানে-সেখানে পড়ে আছে।

ক্রমশ আরও রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মণির মায়ের একটা একটানা গোঙানির মত শব্দ শোনা যেতে লাগল। মণির বৌ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, এখন তার জ্ঞান হয়েছে বটে কিন্তু সে কাঁদেনি—স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বসে আছে। সবে বেচারীর এক বছর বিয়ে হয়েছে, তায় অন্তঃসত্ত্বা।

একে একে ঘুমিয়েও পড়ল দু-একজন করে।

সিঁড়ির মুখে কোণের রেলিংটাতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন হিতেনবাবু। অসহ শোকের ক্লান্তির মধ্যে একটু ঢুলুনি শুরু হয়েছে তাঁর। মধ্যে মধ্যে চম্‌কে তন্দ্রা ভেঙে গিয়ে কথাটা যখনই মনে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন—'ওরে বাপ্‌ রে!'

শুধু ঘুম নেই রায় বাহাদুরের। কত কী কথা মনে পড়ছে তাঁর। ছোট বড় কত কি স্মৃতি। শৈশব থেকে এতকাল পর্যন্ত মণির বড় হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর পক্ষে ঘুমানো সম্ভব নয়।

মণির মায়ের গোঙানি থেমে এসেছে। শুধু ওরই মধ্যে এক একবার নতুন করে কেঁদে উঠছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—তারই শব্দে ঘরের অন্য আত্মীয়দের তন্দ্রার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে সম্বিৎ ফিরে আসছে। তারা সশব্দে একবার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

পাশের ঘরে কার নাক ডাকার শব্দ শুরু হ'ল।

চুণীবাবু বোধ হয়। কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বল্‌তে গেলে মৃতের-ঘরেই নাক ডাকার শব্দটা অনেকেরই অশোভন লাগ্‌ল—কিন্তু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলে চুপ করে গেল। কারণ

কে ওঁকে গিয়ে ডাকবে? কীই বা বলবে? প্রত্যেকেই আশা করতে লাগল অপর কেউ গিয়ে কর্তব্যটা সমাধা করবে—ফলে কারুর দ্বারাই হয়ে উঠল না।

চুণীবাবুর ঘুম গাঢ়তর হয়ে উঠল।

শেষরাত্রে আবার দু একজন করে পাড়ার লোক এসে জড়ো হ'ল। দূরস্থিত আত্মীয়রাও আসতে লাগলেন এক এক করে। আবার নতুন করে কান্নার রোল উঠল। নিয়ে যাবার সময় আসন্ন বুঝে মা আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগলেন। বৌমার ফিট্ শুরু হ'ল মুহুর্মুহু।

চুণীবাবু গাঢ় নিদ্রা থেকে উঠে এসে সামনেই প্রথম দেখলেন ওঁর এক ভাগ্নী-জামাইকে, অকস্মাৎ তার গলাটা জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন, 'এ তোরা কী করলি ভাই স্নরেন? তোরা থাকতে বাবা আমার বেঘোরে মারা গেল!'

স্নরেন মুখখানাকে যথেষ্ট করুণ করবার চেষ্টা করে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এ সময়ে চোখে জলটা আসা উচিত ছিল কি না, অন্তত তার কাছে কেউ আশা করে কি না, ঠিক বুঝতে না পেরে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পুরোনো ঠাকুর বৃন্দাবন বড়লোকের বাড়ী দীর্ঘদিন আছে—ইতঃপূর্বে আরও বড়লোকের বাড়ী নাকি ছিল সে—একটা হিটার জ্বেলে জল চড়িয়ে দিলে। শশী ঝি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলে, 'এই সাত-সকালে গরম জল কি হবে ঠাকুরদা? ছেলেমেয়েদের ত এখনও ঘুমই ভাঙেনি।'

ঠাকুর গম্ভীর মুখে শুধু জবাব দিলে, 'চা হবে, চা।'

'চা?' শশী অবাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু কিছুক্ষণ।

কমা ও সেমিকোলন

চা তৈরি হলে মন্মথ একটা বড় ট্রেতে করে আট দশটা ধূমায়িত কাপ সাজিয়ে সামনে এনে ধরলে।

চা!—!

সবাই বিস্মিত হ'ল। বোধ হয়, একটু অপ্রতিভও।

চা খাওয়া উচিত হবে কি এ সময়ে? এই মুহূর্তে?

এই প্রশ্নটাই জাগে সকলের মনে। কিন্তু সেটা তখন এত প্রয়োজন, এত লোভনীয় যে কেউই একেবারে অস্বীকার করতে পারলে না। সকলেই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিতে লাগল অপরকে, 'ওঁকে আগে দাও।'

অর্থাৎ দু চারজন আগে নিক—নইলে চা খাওয়া এ সময়ে শোভন হবে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউই কিন্তু এ কথা বলে না যে 'আমি খাবো না।' প্রত্যেকেরই ঐ কথাটা উহ্য রইল—আগে ওঁর হোক, তারপর আমাকে দিও।

মন্মথও বহুদিনের খানসামা। সে বার তিন চার ঘুরে আর কাউকেই ট্রে থেকে কাপ তুলে নিতে বললে না—নিজেই এক এক কাপ প্রত্যেকের সামনে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেউই প্রতিবাদ করলে না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল, একজন আগে তুলে নিলেই নেওয়াটা সহজ ও শোভন হয়।

প্রথমে নিলেন চুণীবাবু। তারপর হিতুবাবু। তারপর সকলেই। পাড়ার বৃদ্ধ দ্বিজুবাবু একবার যেন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এখনও অবশ্য ছুঁৎ লাগেনি। তা ছাড়া—তা ছাড়া পানকে বোধ হয় দোষ নেই—' তিনিও তুলে নিলেন চায়ের কাপ।

রায় বাহাদুর নিজেও।

চায়ের পর্ব শেষ হতে হতে রোদ উঠে গেল। রায় বাহাদুরের আশ্রিত

মামাতো ভাই অজিত ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছে। সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে কখন বাইরে গিয়েছিল—এখন এক রিক্সা করে সাধারণ একটা দড়ির খাটিয়া এনে হাজির।

রায় বাহাদুর তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে বসে ছিলেন একটা ঈজি চেয়ারে—সোজা হয়ে। খাটিয়া রাখার শব্দে চোখ খুলে দেখেই যেন জলে উঠলেন, 'একি!……এ কে আনলে? অজিত?……দূর হয়ে যাও, এখুনি, এই মুহূর্তে। যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!'

'আহা কেষ্ট, অত অধীর হয়ো না, ছিঃ!'

সামনে এগিয়ে এলেন হিতুবাবু, 'অজিত, তোমার বুদ্ধির দোষেই চিরকাল তুমি বকুনি খাও। খেটেও মরো অথচ কারুর কাছে তোমার আদর নেই—শুধু এই জন্যে!……এই খাটিয়া তুমি এনেছ মণির জন্য!'

রায় বাহাদুর সুরেনের দিকে ফিরে বললেন, 'বাবা সুরেন, যাও ত, একটা ভাল বোম্বাই খাট……উহু-হু, বাবা আমার রে!'

কথা শেষ করতে পারলেন না রায় বাহাদুর, আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন।

সুরেন তৎক্ষণাৎ বললে, 'হ্যাঁ এই যে মামাবাবু, দোকান খুলুক, এই ত সবে সাতটা।'

তারপর একটুখানি মাথা চুলকে হিতুবাবুকে বললে, 'আচ্ছা, তার চেয়ে যে খাটখানাতে মণি বিয়ের আগে শুত……মানে এখন যেটা ঐ ঘরে আছে, ঐটেই—'

হিতুবাবু একটু যেন বিপন্ন হয়ে মুখ তুলে রায় বাহাদুরের দিকে তাকালেন। রায় বাহাদুর ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন, 'ওটা আসল বার্মা

টিকের খাট··· ··অর্ডার দিয়ে করানো······তা ছাড়া খুলে বার করা সেও ত একটা হাঙ্গামা।'

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,'তা ছাড়া, ও ত ভারী হবে—দু'চার জনে নিতে পারবে না।'

'তার জন্যে কিছু ক্ষতি নেই। আমার মণিকে নিয়ে যাবার লোকের অভাব হবে না।···কিন্তু'—বাধা দিয়ে বলে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'এতকাল মণি শুয়েছে ও খাটে, ওটাতে তার কত স্পর্শ লেগে আছে···না হিতু, ও খাট প্রাণ ধরে দিতে পারব না। তা ছাড়া, বৌমাই বা কি মনে করবেন?······সুরেন, তুমি অন্য খাট আনিয়ে নাও।'

খাট পৌঁছবার পর বুকফাটা কান্না এবং আকুলতার মধ্যে অতি কষ্টে দেহ বার করে এনে বাইরে শোওয়ানো হ'ল।

'ওরে, কে আছিস্, মণি······মণিকে আমার সাজিয়ে দে তোরা—'

'হ্যাঁ মামাবাবু, সে ব্যবস্থা হয়েছে।' সুরেনের স্ত্রী রত্না তাড়াতাড়ি চন্দনের বাটি হাতে এগিয়ে এল। একটা লবঙ্গ দিয়ে সযত্নে সে চন্দন পরিয়ে দিলে মণির কপালে। তারপর একটা নতুন দেশী ধুতি পরিয়ে দামী শাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল বুক থেকে পা পর্যন্ত।

এইবার ফুল।

এঁরাও ফুল এনেছিলেন যথেষ্ট কিন্তু তার বোধ করি প্রয়োজন ছিল না। পাড়ার বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল মণি, কোনটার সেক্রেটারী, কোনটার ভাইস্-প্রেসিডেন্ট। তারা সকলেই ফুল কিনে এনেছে।

এ বাজারে ফুল শেষ হতে, কেউ ছুটেছে নিউ মার্কেটে—কেউ বা বৌবাজারে।

প্রথমেই এলেন পাড়ার শিশু-মিলনীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিসেস্ চৌধুরী।

অকস্মাৎ শোকার্ত বাড়ীর আবহাওয়াকে চম্‌কে দিয়ে বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'য়্যাবাউট্ টার্ন', ফর্ম টু, ঠিক আছে, মালতী তুমি এগিয়ে এস, রেবা মালতীর জায়গায় যাও। নাউ, মার্চ স্লো। মনে থাকে যেন অত্যন্ত করুণ তোমাদের কর্তব্য আজ, কেউ কথা কইবে না, কেউ অন্য কোন দিকে চাইবে না—দুজন দুজন করে এগিয়ে যাও।'

মার্চ করে এল মেয়েরা, উঠান ভরে দালান সুদ্ধ লাইন দিয়ে দাঁড়াল। মুখ তাদের পাথরের মত ভাবলেশহীন, কেউ কোন দিকে চাইছে না। সত্যিই বাহাদুরী আছে মিসেস্ চৌধুরীর—ঐটুকু ছেলেমেয়েদের তিনি মিলিটারী ড্রিলের লৌহ-স্বভাব দিতে পেরেছেন। প্রথম দুজন মেয়ের হাতে ছিল দুটি 'রিদ্', তারা ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে এসে মৃতদেহের ওপর সযত্নে ও সসম্ভ্রমে সে দুটি রেখে দিলে।

তারপর মিসেস্ চৌধুরী মৃতদেহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন······'হে ঈশ্বর, অত্যন্ত অসময়ে তুমি আমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতিকে কেড়ে নিলে। জানি না এতে তোমার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। নিশ্চয়ই কোন মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করেছ। তাই আজ আমরা বৃথা শোক করব না। শুধু তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর আত্মা শান্তি পায়, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।'

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অস্ফুট কণ্ঠে সেই প্রার্থনা আউড়ে গেল।

কমা ও সেমিকোলন

তারপর মিসেস চৌধুরীর ইঙ্গিতে ওরা আবার য়্যাবাউট টান´ নিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী নিজে আর একটু রইলেন। এবার তিনি একটা সাদা রুমাল বুকের কাছ থেকে বার করে দুই চোখের কোণ অত্যন্ত সন্তর্পণে স্পর্শ করলেন।

রায় বাহাদুর অভিভূত ক্লান্ত কণ্ঠে একবার 'ও হো হো' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁরে কেউ মধুবাবুকে খবর দিয়েছে? তিনি না আমাদের আবার দোষারোপ করেন—'

মধুবাবু এক বিখ্যাত দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার।

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দাদা, আমি সব ফোন কবে দিয়েছি। এ-পি-আইকেও একটা ফোন করে দিয়েছি যদি ওরা কোন রিপোর্টার পাঠাতে চায়।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'এ পাড়ায় কালান্তবের কে একজন বিপোর্টার আছেন না?'

'তিনি বাড়ী নেই। বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে। দু বার লোক পাঠিয়েছি—'

'থাক্। থাক্। অত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমাদের শুধু কর্তব্য পালন করা। বরং ভাল বোঝ একটা চিঠি লিখে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে এলেই যাতে চিঠিটা পায়—'

'আচ্ছা দাদা, এখনই পাঠাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে মৃতদেহকে নিয়ে সামান্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পাড়ার আর-ডবলু-এ-সি'র ছেলেরা কোথা থেকে কয়েকটি বড় পদ্মফুল এনেছিল। সেগুলি ওর মাথার বালিশের ওপর দিয়ে, মাথা ঘিরে দুই কাঁধ পর্যন্ত সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ফুটন্ত পদ্মেব মাঝ-

খানে সেরা পদ্মটি নিমীলিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্বের। এখন মণির সম্বন্ধীরা দুটি উৎকৃষ্ট রজনীগন্ধার গোড়ে মালা এনেছে, তারা চায় মাথার ওপর দিয়ে মালাটা বুক পর্যন্ত লম্বা করে দিতে—সব ফুলের ওপর।

ছেলেরা বলছে, 'দেখুন, পদ্মফুলগুলোর ভাল এফেক্ট হয়েছে, ওর ওপর দিয়ে মালা দুটো দিলে সব ফুল ঢেকে যাবে। তার চেয়ে দুটো মালা বুকের ওপর পাশাপাশি মেলে সাজিয়ে দিন।'

বড় সম্বন্ধী বঙ্কিম একটু উষ্ণভাবেই বললে, 'তাই কখনও সম্ভব! মালা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে না দিলে মালা দেওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া দেখুন, ও আমাদের ভগ্নীপতি, আমাদেব এই মালা দেওয়ার একটা বিশেষ সিগ্‌নিফিকেন্‌স্ রয়েছে যে!'

'উনি আপনাদের আত্মীয় হতে পারেন, কিন্তু উনি ছিলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণ; আমরা ছিলুম ওঁর দিন-রাতের সহচর। আমাদের দাবী কারুর চেয়ে কম, এ আমরা মানব না।' একটি ছেলে বলে উঠল।

এগিয়ে এলেন মিসেস চৌধুরী। তিনি মধুর করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, ছেলেরা কিন্তু ঠিকই বলেছে। পদ্মফুলের একটা বিশেষ এফেক্ট হয়েছে, সেটা নষ্ট করা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে মাথার ওপর দিয়ে যদি দিতেই চান ত বরং মালা দিয়ে তার ওপর পদ্মফুলগুলো আবার রি-য়্যারেঞ্জ করতে হয়।'

'না না, তাহলে মালা দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা। আচ্ছা, আমরা মালা খুলে গলায় দুপাশ দিয়ে গুঁজে দিচ্ছি, যাতে মনে হয় গলায় পরা আছে।'

কমা ও সেমিকোলন

খুশী হয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'তাই করুন। হ্যাঁ, পদ্ম, রিদ্ এগুলোর এফেক্ট আলাদা কিনা। দেখুন, কাইগুলি মালা দেওয়া হলে আর একটা কাজ যদি করেন—ঐ রিদ্ দুটো চাপা পড়ে গেছে, যদি তুলে আবার পায়ের কাছে সাজিয়ে দেন!···হ্যাঁ—ঐ, ঠিক হয়েছে। রিদ্‌ই এখানে বিশেষ উপযোগী কিনা। ওটার—'

রায় বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'কৈ মধুবাবু ত এলেন না? সুরেন, বাবা, এমনি জনা-দুই ফটোগ্রাফার ডেকে আনো। আমাদের কর্তব্য ত করতে হবে। গোটাকতক ব্লক করিয়ে কাগজে কাগজে—। এব পর না আমাদের কেউ দোষে।'

সুবেন বললে, 'এখানে অনেকেরই ক্যামেবা রয়েছে মামাবাবু, সাজানো কম্‌প্লিট্ হলেই ওরা ছবি নেবে।'

'তা হোক। সে ওঁরা নিতে চান নিন। কিন্তু প্রোফেশন্যাল দু-একজন আনা দরকার। যদি এঁদের ছবি শেষ অবধি না ওঠে। হাজার হোক্, এমেচার ত! উই কান্‌ট্ টেক্ দি রিস্ক।'

প্রোফেশন্যাল ফটোগ্রাফার এলেন, আরও অনেকে ছবি নিলেন। ইতিমধ্যে মধুবাবুও এসে হাজির। সকলে সসম্ভ্রমে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলেন তাঁকে। চুণীবাবু তাঁকে দেখেই 'মধু ভাই, কী দেখতে এলি আর—সব শেষ যে ভাই' বলে কেঁদে উঠলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার ফটোগ্রাফার আনোনি?'

একটু ইতস্তত করে মধুবাবু চুপি চুপি বললেন, 'না।—আজকাল ওবা যেখানে-সেখানে ফটোগ্রাফার পাঠাতে চায় না দাদা। কাগজে স্পেস্ কম।'

চুণীবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'এটা যেখানে-সেখানে

হ'ল ! জানো, অন্তত সাতটা প্রতিষ্ঠানের ও এগজিকিউটিভ বডির মেম্বার ছিল ?'

'ঠিক আছে দাদা, ছবি ত উঠছে······আমি সে ব্যবস্থা করে দেব—'

একজন ফটোগ্রাফার বললেন, 'চুণীবাবু, যদি কিছু মনে না করেন······ বৌমাকে একবার এনে পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে—'

কে একজন বলে উঠলেন, 'আ ছি ছি ! তাঁকে কেন আবার এমন নাটকীয়ভাবে টানাটানি করা ; বেচারা একে কাতর—'

'না না। তাতে কি হয়েছে। তিনি ত আসবেনই। ঠিক বলেছেন আপনি। শেষ ফটোগ্রাফ দুজনে···ওরে ও রত্না—' চুণীবাবু ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বৌমাকে কোনমতে ধরে এনে বসানো হ'ল। সে বেচারী কিন্তু এসে মৃতদেহ দেখেই আছড়ে পড়ল, মণির দু'পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুম্‌রে উঠতে লাগল।

ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কৈ, ছবি নিলেন না ?'

'এখন—মানে, এভাবে ত ছবি হয় না। একটু সামলে নিন্—মুখ তুলে না বসলে এফেক্টটা ভাল হবে না যে ! উনি মুখ ঢেকে থাকলে আর কী হ'ল !'

রায় বাহাদুর নিজেই এগিয়ে এলেন, 'ওমা—মাগো, একবার তোর মুখখানি তোল্ ত মা, ওদের কাজটা ওরা করুক। মা রে—'

বিহ্বলের মত সে বেচারী মুখ তুললে।

হিতুবাবু কাকে যেন ডেকে বললেন, 'রত্নাকে বল, ওর মুখখানা একটু

মণির মুখের দিকে ফিরিয়ে দিক। যেন একদৃষ্টে ও মণির মুখের দিকে চেয়ে আছে—বুঝতে পারলে না?'

ছবি তোলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বঙ্কিম ছুটে এসে বোনের মুখের উপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিলে।

'আহা হা, সরালেন কেন, এফেক্টটা ত ওতে ভালই হচ্ছিল!' মধুবাবু বললেন।

'উহুঁ, সে রকম এলোমেলো এখনও আছে। ওটা যা সরিয়ে দিলুম, ওতে একেবারে মুখ ঢেকে যাচ্ছিল যে!'

ছবি তোলার পর মহাযাত্রার পালা।

আর একপ্রস্থ কান্না ও আকুলতা।

এরই মধ্যে এক বৃদ্ধ এসে বললেন, 'একটু প্রার্থনা করব হিতুবাবু। ইচ্ছে হচ্ছে একটু করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ত!'

সে ভদ্রলোক ব্রাহ্ম। তিনি নিজের মত প্রার্থনা করতে শুরু করলেন; কিন্তু দু-এক লাইন বলবার পরই দেখা গেল, তিনি ঠিক প্রার্থনা করছেন না—ছোটখাটো বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার মধ্যে মণি তাঁকে কি রকম ভালবাসত এবং মান্য করত, সেই কথাই বেশি।

রায় বাহাদুর হিতুবাবুকে ডেকে বললেন, 'আমাদের মহামহোপাধ্যায়কে ডেকে আনবে নাকি, একটু স্বস্তিবাচন করতেন?'

'ঠিক। এখনই যাচ্ছি।'

মহামহোপাধ্যায় এলেন কিছু বিলম্বে। তাঁর স্বস্তিবাচন শেষ হ'তে হ'তে বেলা এগারটা বাজল।

কমা ও সেমিকোলন

হিতুবাবু বললেন, 'এই পাড়াটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে ত ?'

রায় বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ—আর যদি সম্ভব হয় ত ত্রিকোণ পার্কের দিক দিয়ে ঘুরে—ওরা সবাই ত ভালবাসত ওকে !'

ছেলেরা একটু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে একজন বললে, 'তার আর দরকার কি হবে জ্যেঠামশাই, দু'পাড়া ত ভেঙে পড়েছে। সবাই ত উপস্থিত।'

'তা বটে। যা তোমরা ভাল বোঝ বাবা।'

বঙ্কিম এগিয়ে এসে চুপি চুপি চুণীবাবুকে বললে, 'হাতে হীরের আংটিটা রইল কিন্তু কাকাবাবু, মিনে-করাটা না হয় থাক্—' তারপরই যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে ম্লান হেসে বললে, 'এখনও এসব কথা চিন্তা করতে হচ্ছে এইটেই সবচেয়ে দুঃখের কথা ; কিন্তু এসব ত এখন শিখুর পেটে যেটা আছে তার—নাবালকের জিনিসের জন্যে জবাবদিহি ত করতে হবে আমাদের—'

চুণীবাবু শেষের কথাটায় একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'ছাখো, তোমরা ত যাচ্ছো—শ্মশানে গিয়ে খুলে নিয়ো না হয়—এখানে এখন ওসব করতে গেলে বিশ্রী দেখাবে না ?'

'তা ত বটেই। না, তাই বলছিলুম। কর্তব্যে ত্রুটি হ'লে ত চলবে না !'

ততক্ষণ মৃতদেহ গলিতে বেরিয়েছে, মিসেস্ চৌধুরী শোভাযাত্রা ঠিক করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। আগে পাড়ার ব্যাণ্ডপার্টি যাবে, তারপর ওঁর শিশু-মিলনীর ছেলেমেয়েরা (তারা এতক্ষণ ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে ছিল সার বেঁধে—সুতরাং ওদের দাবী অগ্রগণ্য), তারপর আর-ডবলিউ-এ-সি'র দল, তারপর মৃতদেহ, তারপর অন্যান্য ক্লাব, সব শেষে আত্মীয়রা এবং তারও পিছনে কীর্তনের দল।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

শোভাযাত্রার ব্যাগপাইপের সুর এবং কীর্তনের ধ্বনি ক্রমশ মিলিয়ে গেল—দূর থেকে দূরান্তরে। বাড়ীর কান্নার আওয়াজও একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মা'র একটা একটানা গোঙানি এবং শিখরিণীর অব্যক্ত অস্ফুট একটা কাতর শব্দ শোনা যেতে লাগল শোকাহত বাড়িটার ক্লান্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

—শেষ—